# দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

## জোবোজে অতীশ

## বিপুল সাহা

## প্রান্তিক

Dipankar Srigyan Joboje Atish
by Bipul Saha
published by
Prantik
Price - Rs.80.00

প্রকাশ কাল ঃ এপ্রিল, ২০১০
বৈশাখ, ১৪১৭
গ্রন্থস্বত্ব ঃ ভারতী সাহা

প্রকাশক ঃ প্রান্তিক
জি ডি- ১৩৫, সেকটর-৩
সল্ট লেক, কলকাতা-১০৬

চিত্রসজ্জায় ঃ কিংশুক সরকার
প্রচ্ছদচিত্র সামনে গুরু রিনপোচে, অতীশ দীপঙ্কর ও অতীশ দীপঙ্কর।
পিছনে তিব্বতের সামোয়ে ও থোলিং বিহার।
অ( র বিন্যাস ও প্রচ্ছদ রূপায়ণ ঃ রূপা পাল

মুদ্রক ঃ আশুতোষ লিথোগ্রাফিক
১৩, ছিদাম মুদি লেন।
কোলকাতা-৭০০০০৬
ফোন ঃ ২৫৫৪-৫৫৯৩, ৯৮৩০৩-৬৯৫৪২

প্রাপ্তিস্থান ঃ দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট - ৭৩
আদিনাথ ব্রাদার্স, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - ৭৩
পাত্রজ পাব্লিকেশন, ২শ্যামারচণ দে স্ট্রীট - ৭৩
মহাবোধি বুক এজেন্সি, ৪এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট- ৭৩
এবং
পি-২৪৫/১, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড
কোলকাতা-১০। দূরভাষ - ০৩৩৩২৫৫০২৯১

বিনিময় মূল্য ঃ ৮০ টাকা

বাল্যবন্ধু

নাট্যব্রতী ও সাহিত্যিক
সুনীল দাশ-কে

# নিবেদন

সারনাথের মূলগন্ধকুটিবিহারে বসে একখানি ইংরেজি গ্রন্থ 'অতীশ অ্যাণ্ড টিবেট' হাতে এসেছিল। তখনই অতীশ দীপঙ্করের কথাটা মাথায় আসে। ইতিহাস, জীবনকথা, ভ্রমণ, ধর্ম ও দর্শনসাহিত্য মাখামাখি হয়ে আছে , এমন চরিত্র নিয়ে চর্চা করতে কার না ভালো লাগে! একে তো ইনি বঙ্গসন্তান তার উপর জীবনযাত্রায় দুঃসাহসী। কোন বাল্যবয়সে সুখী গৃহকোন ত্যাগ করে মন্ত্রতন্ত্র চর্চার শুরু। তারপর দী(া নিয়ে ক্লাসিকাল বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করতে বসলেন। একদিন সমুদ্রে ভেসে চলে গেলেন সুবর্ণদ্বীপ জাভায়। বোধিচিত্ত সাধনা করতে। দেশে ফিরে কিছুকাল অধ্য( তা করে আবার অজানা ও দুর্গম দেশ তিব্বতে পা বাড়ালেন উত্তুঙ্গ হিমালয় অতিত্র(ম করে। যে বয়সে মানুষ বার্ধক্যভারে নুয়ে পড়ে, কর্মবীর সেই বয়সে তিব্বত চষে বেড়ালেন। বারাণসী থেকে গ্রন্থটি সংগ্রহ করলাম। ঘরে ফিরে মাতৃভাষায় একখানি চটি বইও পেলাম। তৃপ্তি হল না। সেই অতৃপ্তি তাড়িয়ে নিয়ে পৌঁছে দিল বর্তমান প্রচেষ্টায়।

দুঃসাহসে ভর করেই নানা সূত্রে গ্রন্থ ও তথ্য সংগ্রহ করতে লেগে পড়েছিলুম। যন্ত্রগণকে অন্তর্জাল ঘাঁটতে ঘাঁটতে আরো উৎসাহ পেলাম। প্রায়শ ইতিহাসের সঙ্গে লোককথা ও জনপ্রবাদ জড়িয়ে থাকে মহাজীবন ঘিরে। চেষ্টা ছিল – যদি ইতিহাসের অমর্যাদা না করে সাধারণের জন্য সুপাঠ্য কাহিনী রচনা করা যায়। সবটা হয়তো হয়ে ওঠেনি। কারণ সবটা কখনো হয় না। জানি না তবু কিছুটা উৎরে যেতে পারলো কি না। উৎসাহ যোগালো অনেকে।

অতীশ দীপঙ্কর সম্পর্কে তথ্যসূত্র মেলে নিচের গ্রন্থসকল থেকে।

বু-স্তোন রিনপোচে (১২৯০-১৩৬৪ খৃঃ), সং( পে বুস্তোন বা বুতোন, রচনা করেন ভারতে-তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস 'দে-বার শেগস-পাই স্তান-পাই সাল-বায়েদ চোল-কিই বায়ুং-নাস সাং-রাব রিনপোচেই জোড'। ১৩২২ খৃষ্টাব্দে।

গোস লোসাব শোন-নু-পল (১৩৯২-১৪৮১ খৃঃ), সং( পে 'গোস লোসাব', ১৪৭৬-৭৮ খৃষ্টাব্দে লেখেন 'বোড-কিই-ইয়ুল-ডু-চোস-ডাং-চোস-রা-বা-জি-টার-বায়ুং-বাই-রিম-পা-ডেব-থের-স্নোং-পো', সং( পে ডেব-স্নোং যা 'ব্লু-অ্যানাল্‌স্' নামে সুপরিচিত।

তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারানাথ। জন্ম ১৫৭৫ সালে। তিনি ভারতে বুদ্ধধর্মের সুদীর্ঘ ইতিহাস, 'গ্যা-গর-চোস-বায়ুং', রচনা করে গিয়েছেন ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে।

সুম-পা খান-পো ইয়ে-শেস-পল-বায়োর (১৭০২-১৭৭৫ খৃঃ), সুম এলাকার মানুষ বলে সংে পে বলা হয় 'সুমপা'। ১৭৪৮ সালে রচনা করেন 'পাগ-সাম-জোন-জাং'। শরৎ চন্দ্র দাস ১৮৯৮ সালে কোলকাতা থেকে তার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এর উপর নির্ভর করে এ. এইচ. ফ্রাংক রচনা করেন 'অ্যান্টিকুইটিস অব ইণ্ডিয়ান টিবেট' এবং 'এ হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ন টিবেট'। ইতিমধ্যে ১৮৫৯ জার্মান পণ্ডিত কোপেন আচার্য দীপঙ্করের কথা প্রকাশ করেন। অলকা চট্টোপাধ্যায় ১৯০৮ সালে সম্পাদিত তার অংশবিশেষের ইংরেজি অনুবাদ 'অতীশ অ্যাণ্ড টিবেট' গ্রন্থের পরিশেষে সংযোজন করেছেন।

উনিশ শতকের শেষের দিকে বঙ্গদেশের চট্টগ্রামের **শরৎ চন্দ্র দাস** (১৮৪৯-১৯১৭ খৃঃ) একাধিকবার তিব্বত ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ভ্রমণান্তে অনেক অভিজ্ঞতার সঙ্গে বহু পুঁথি সংগ্রহ করে আনেন। তার উপর ভিত্তি করে তিনি লিখেছিলেন ১৮৯৩ সালে 'লাইফ অব অতীশ'। প্রকাশক 'জার্নাল অব বুদ্ধিস্ট টেক্সট সোসাইটি'। তথ্যভিত্তি সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন — কল্যাণমিত্র 'ফায়াগ-সোর-পা' গুনথাংয়ে অতীশের প্রত্য( শিষ্য ও সহচর নাগসো (জয়শীল)-এর কাছ হতে অতীশের জীবনকথার তথ্য সংগ্রহ করেন। ঐ তথ্য থেকে 'খান-পো-চিম-থামস-সাড-খায়েন-পা' নামে ১২৫০ সালে তিব্বতে প্রকাশ করেন একখানি গ্রন্থ। পরবর্তীকালে শরৎ চন্দ্র দাস কর্তৃক 'ইণ্ডিয়ান পণ্ডিটস ইন দি ল্যাণ্ড অব স্নো' গ্রন্থে ঐ জীবনকথা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে রূপার প্রকাশনায় ইণ্ডিয়ান পণ্ডিটস গ্রন্থটি সহজলভ্য হয়েছে। তিনি আরো লিখেছিলেন 'ট্রাভেল অ্যাকাউন্টস অব টিবেট'। প্রকাশক লণ্ডনের ব্রিটিশ জিওগ্রাফিকাল সোসাইটি। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে অতীশ দীপঙ্করের বিস্মৃত কাহিনী আধুনিক সভ্যজগতের কাছে আরো উন্মোচিত হয়েছে।

সম্প্রতি (১৯৬৭ সালে প্রথম প্রকাশিত, ১৯৯৯ সালে শেষ মুদ্রিত) গবেষিকা অলকা চট্টোপাধ্যায় 'অতীশ অ্যাণ্ড টিবেট' শিরোনামে মূল্যবান একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। নগোয়াং নিমা রচিত ও লামা চিমপা কর্তৃক মার্জিত 'এ নিউ বায়োগ্রাফি অব অতীশ' নামক অংশটি ঐ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে অতীশের রচিত-অনূদিত দীর্ঘ গ্রন্থতালিকা ও অতীশ রচিত কিছু শাস্ত্র ও উপদেশাবলী।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন (১৮৯৩-১৯৬৩ খৃঃ) 'তিব্বতে সওয়া বছর' লিখেছেন ১৯৩০ সালে। তিব্বত ভ্রমণান্তে। গ্রন্থে অতীশ দীপঙ্করের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। তার অনুবাদ করেছেন মলয় চট্টোপাধ্যায়। চিরায়ত প্রকাশন থেকে প্রকাশিত।

বর্তমান রচনার জন্য নির্ভর করেছি আরো যে সব গ্রন্থের, তার সূচী পরিশেষে দেওয়া হয়েছে। প্রধান সূত্র অবশ্যই অলকা চট্টোপাধ্যায় ও শরৎ চন্দ্র দাসের গ্রন্থ এবং কিছুটা রাহুল সাংকৃত্যায়নের গ্রন্থ। তথাগত বুদ্ধের ধর্ম কি করে কালচত্রে( এমন জটিলাকারে বিবর্তিত হল এ ব্যাপারে আগ্রহ ছিল। পূর্বজদের গবেষণালব্ধ ফলে তা জানা সহজসাধ্য হয়েছে। চিত্র-মানচিত্র ঐ সকল গ্রন্থ ও নানা সূত্র হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলে আমার প্রচেষ্টা অনেকটা সংকলকেরও বটে। তথ্যসূত্রে বর্ণিত সকল সূত্র ও গ্রন্থের লেখক-লেখিকা এবং প্রকাশক-প্রকাশিকার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

ইংরেজী হরফ থেকে তিব্বতী নামধামের বাংলা রূপান্তর দেখছি বেশ গোলমেলে। এক এক সূত্রে এক এক রকম নামধাম। তার কতটা নিরসন সম্ভব হল তা ভবিষ্যতে বিদগ্ধ জ্ঞানীরাই বলতে পারবেন। এজন্যে প্রারম্ভেই ( মাপ্রার্থী।

একই ঘটনাত্র(ম নিয়ে অনেক প্রকার কথা আছে। ইতিহাস আছে। আবার অনেক সূত্রে পাওয়া নানা কাহিনী আছে যার সত্যতা যাচাই করার উপায় অধরা। নানা সূত্র থেকে কথা ও কাহিনী তুলে এনে বয়ন করার চেষ্টা করেছি পাঠক সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে। ঐতিহাসিক বর্ণন বিকৃত না করেই সে চেষ্টা ছিল। কাল্পনিক কথোপকথন হলেও মূল ভাবে ফাঁকি নেই। গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধির দায় সত্ত্বেও অতীশের দুটি রচনা 'বিমল-রত্ন-লেখ-নাম' ও 'বোধিপথ-প্রদীপ'-এর ভাবানুবাদ ও কিছু উপদেশামৃত যুক্ত( না করে পারা গেল না। প্রিয় শিষ্য জয়াকরের গুরুবন্দনাও তুলে ধরতে হল। নৈতিকতার প্রবল অব( য়ের জোয়ারে এই সকল ধর্মীয় গুরুবচন কোন কাজে আসে কিনা কে জানে! তবে কেবল ধর্মে নয়, সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় চেতনায়ও একটা নৈতিক স্তর তো অবশ্যই সর্বজনের মান্য হওয়া উচিত।

রচনাকর্মে ও প্রকাশনায় সাহায্য করেছেন অনেকেই। চিত্রসংগ্রহে সাহায্য করেছে পুত্রপ্রতীম কিংশুক সরকার। মানচিত্র রচনায় প্রার্থিত সাফল্য অধরা থেকে গেল। প্রকাশনায় আর্থিক সাহায্য পেয়েছি গৃহকল্যাণী ব্যতীত দেবদ্যুতির কাছে। প্রচ্ছদরচনায় রূপা পাল সর্বদাই এগিয়ে এসেছে। মুদ্রণে ও ব্যবস্থাপনায় সঞ্জীব সাহার বদান্যতা অনস্বীকার্য। প্রান্তিকের প্রাণপুরুষ খগেশ দেববর্মনও প্রকাশনায় সাহায্য করেছেন। তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

এখন পাঠকসমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেই পরিশ্রম সার্থক।

নিবেদনান্তে
বিনীত
বিপুল সাহা

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড
কোলকাতা-১০

# সূচীপত্র


| | পৃষ্ঠা সংখ্যা |
|---|---|
| তিব্বতীয় ও ভারতীয় নাম | ৮ |
| ১. ভূমিকা | ১১ |
| ২. বিত্র(মপুরের চন্দ্রগর্ভ | ১৩ |
| ৩. তান্ত্রিক গুহ্যজ্ঞানবজ্র | ১৯ |
| ৪. বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন | ৩৩ |
| ৫. দী( ানাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান | ৪৩ |
| ৬. সুবর্ণদ্বীপ পর্ব | ৪৯ |
| ৭. অধ্য( দীপঙ্কর | ৬২ |
| ৮. তিব্বতের কথা | ৬৯ |
| ৯. রাজভি( র আমন্ত্রণে | ৮৩ |
| ১০. নেপাল যাত্রা | ১০৫ |
| ১১. থোলিং-এর পথে | ১১৭ |
| ১২. পশ্চিম তিব্বতে তিন বছর | ১২৪ |
| ১৩. বোধিপথ প্রদীপ | ১২৯ |
| ১৪. শিষ্য জয়াকর | ১৩৪ |
| ১৫. মধ্য তিব্বতে | ১৪১ |
| ১৬. নির্বাণ | ১৫৫ |
| জীবনপঞ্জী | ১৬৭ |
| তথ্যসূত্র | ১৬৮ |


মানচিত্র – অতীশের যাত্রাপথ (১০ পৃঃ), প্রাচীন ভারত (৪২ পৃঃ), সুমাত্রা দ্বীপ (৬১ পৃঃ), নেপাল (১০৬ পৃঃ) ও তিব্বত (১১৬ পৃঃ)।

চিত্র – বাংলাদেশের স্মৃতিফলক (১৮ পৃঃ), আচার্য তিলোপা (৩০ পৃঃ), আচার্য নারোপা (৩১ পৃঃ), থোলিং বিহার (৩২ পৃঃ), চোর্তেন (৪১ পৃঃ), রাজা স্রোংসান গামপো (৭২ পৃঃ), গুরু পদ্মসম্ভব (৭৭ পৃঃ), শরৎ চন্দ্র দাস (৮০ পৃঃ), কমলশীল (৮১ পৃঃ), পোটালা প্রাসাদ (১৩৩ পৃঃ), তাসিলুনপো বিহার (১৪০ পৃঃ), সামিয়ে বিহার (১৫৪ পৃঃ) ও অতীশের স্মৃতিমন্দির (১৬৬ পৃঃ)।



# তিব্বতীয় ও ভারতীয় নাম

| তিব্বতীয় নাম | ভারতীয় নাম বা পরিচয় | |
|---|---|---|
| জোবোজে | মহাপ্রভু, প্রভুস্বামী অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান | |
| স্রোং-সান-গাম-পো | (৬ষ্ঠ শতকে তিব্বতের রাজা) | |
| খ্রি-সোং-দে-সান | (তিব্বতের রাজা, ৭৫৫-৭৮০/৭৯৭ খৃঃ) | |
| লং-ডার্মা, লং-দার-মা | (তিব্বতের রাজা, ৮৩৬-৮৪১ বা ৮৩৮-৮৪২? খৃঃ) | |
| ওদ-স্রুং | (পশ্চিম তিব্বতের রাজা, ৯১৭-৯৮০ খৃঃ) | |
| নি-মা-গোন | (পশ্চিম তিব্বতে নারিস এলাকার রাজা) | |
| লা-লামা খোর-দে, এ-শে-ওদ, লাচেন | | দেবগুরু জ্ঞানপ্রভ |
| | (পশ্চিম তিব্বতে নারিস এলাকায় গুগে-র রাজা) | |
| স্রোং-দে | (এ-শে-ওদের ভাই ) | |
| লা-দে | (স্রোং-দের পুত্র) | |
| ওদ-দে | (লা-দের পুত্র) | সেনপ্রভ (রাজভি( ) |
| বায়াং-চুব-ওদ, জনছুবওদ, লাসুনপো | (লা-দের পুত্র) | বোধিপ্রভ (রাজভি( ) |
| শি-বা-ওদ, পল-লা-সুন-পো | (লা-দের পুত্র) | শান্তিপ্রভ (রাজভি( ) |
| লো-পোন | রিন-পো-চে | পদ্মসম্ভব |
| | জি-বা-সো | শান্তিজীব, শান্তর( ত |
| পেমে-নাং-সুল | | কমলশীল |
| চোস-কাই-গ্রাগস-পা | লামা সেরিলিঙপা | ধর্মকীর্তি বা |
| | সেরিলিঙপা | ধর্মর( ত (সুমাত্রা) |
| নাগসো-তুল-খ্রিম-গিয়াল-বা | নাগসো | জয়শীল (শিষ্য) |
| গ্যা-তোন-গ্রুস-সেং-গে | সেংগে | গ্যা-র বীর্যসিংহ (শিষ্য) |
| বোম-তোনপা-গিয়াল-বাই-বাইয়ুং-নাস | বোম তোনপা | জয়াকর (শিষ্য) |

| তিব্বতীয় নাম | | ভারতীয় নাম বা পরিচয় |
|---|---|---|
| বায়াং-চুব-শেষ-রাব | | বোধিপ্রজ্ঞা |
| লেগস-পাই শেষ-রাব | | সুপ্রজ্ঞা |
| রিনচেন-সাংপো (৯৫৮-১০৫৫খৃঃ) | লোসাব | রত্নভদ্র, রত্নপ্রভ |
| লাই-রিগ-পা-সেং-গে | সেং-গে-গ্রা | সিংহলাদ, সিংহঘোষ, দেববিৎসিংহ,দেববিদ্যাসিংহ |
| ইয়োন-তোন-গ্রাগস-পা | | গুণকীর্তি |
| নিমা-তোন-গ্রাগস-পা | | সূর্যকীর্তি |
| লো-দান-শেষ-অব | | মাটিপ্রজ্ঞা |
| গে-বাই-ব্লো-গ্রোস | | শুভমতি |
| খাইয়ুংপো চোস-কোই-সোন-গ্রুস | | খাইয়ুংপোর ধর্মবীর্য |
| গে-শেষ-সং-ফু-বা | | (শিষ্য) |
| ফায়াগ-পা-খ্রি-চোগ | | (শিষ্য) |
| ফায়াগ-দর-তোন-পা | | (শিষ্য) |
| বু-স্তোন রিমপোচে | বুস্তোন, বুতোন (১২৯০-১৩৬৪ খৃঃ) | |
| গোস লোসাব শোন-নু-পল | গোস লোসাব (১৩৯২-১৪৮১ খৃঃ) | |
| সুম-পা-খান-পো-ইয়ে-শেস-পল-বায়োর | সুমপা (১৭০২-১৭৭৫ খৃঃ) | |



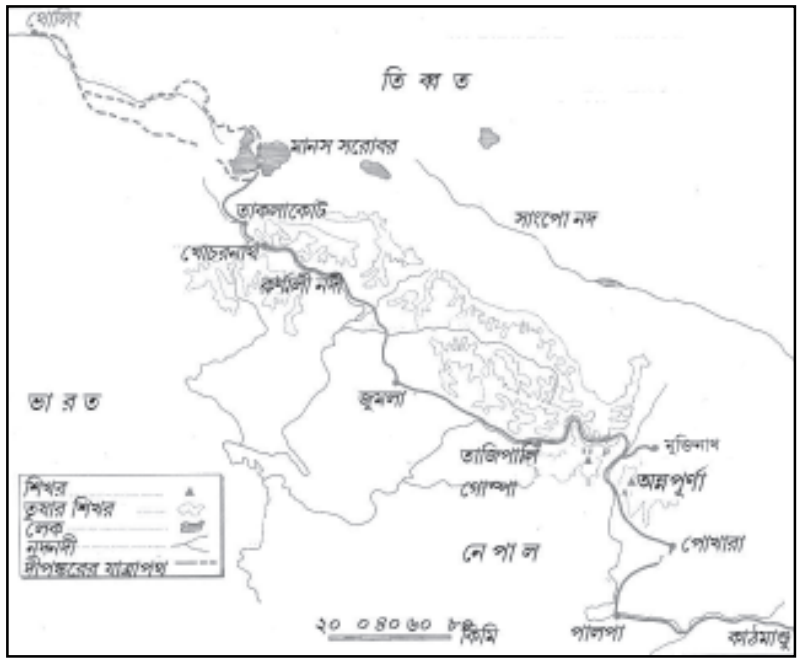


মানচিত্র -১. অতীশের যাত্রাপথ
কাঠমাণ্ডু থেকে পশ্চিম তিব্বতের থোলিং
(সৌজন্যে লেখিকা অলকা চট্টোপাধ্যায় ও মানচিত্রকার সুনীল মুন্সি)।

# দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

## জোবোজে অতীশ

(৯৮২ - ১০৫৪ খৃষ্টাব্দ)

## ১। ভূমিকা

সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে চন্দ্রগর্ভ নামে এক মানবসন্তান এই পোড়া বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শুধু পূর্ব ভারতে নয়, সুদূর দ(িণ-পূর্ব এশিয়ার সুবর্ণদ্বীপে ও শ্রীলঙ্কায়, নেপালে ও তিব্বতে আপন মনীষার উজ্জ্বল স্বা( র রেখে গিয়েছেন। ঐ বঙ্গসন্তান অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে ইতিহাসে, বৌদ্ধদর্শনে ও ধর্মশাস্ত্রে সুপরিচিত।

তাঁর পূর্বনাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। রাজকুমার চন্দ্রগর্ভ কবে থেকে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান হলেন? কবেই বা তাঁর নাম হল অতীশ? 'ঈশ' কথার অর্থ ঈ(রের দেবতা প্রভু স্বামী ইত্যাদি। 'অতি ঈশ' থেকে অতীশ। তিব্বতীরা তাঁকে বলত 'জো-বো-জে'। অর্থ — 'মহাপ্রভু' বা 'প্রভুস্বামী'। ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম। গৃহত্যাগ করে গুরুর কৃপালাভের জন্য স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণ করলেন। জ্ঞানলাভ করলেন। শুরুতে তন্ত্রমন্ত্রে গভীর আগ্রহ জন্মেছিল। এক সময় তাঁর তান্ত্রিক নাম ছিল জ্ঞান-গুহ্য-বজ্র।

পরে মহাযান বৌদ্ধধর্মের মূল স্রোতধারায় দী( াপ্রাপ্ত হন। দী( ান্তে নতুন নামকরণ হল — দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

পূর্ব ভারতের নানা বিহারে নানা গুরুর কাছে অধ্যয়ন করেছেন। পাঠ করেছেন নালন্দা মহাবিদ্যালয়ে ও বিত্র(মশীলায়। তৃপ্তি হল না। একদিন জাহাজে চেপে পাড়ি দিলেন দ(িণ-পূর্ব এশিয়ার সুবর্ণদ্বীপে বর্তমান কালে যা ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ নামে পরিচিত। বারো বৎসর সে দেশে রইলেন। জ্ঞান ও ধর্মশি( ার জন্য।



স্বদেশে ফিরে পূর্ব ভারতের একাধিক বিহারে জ্ঞানচর্চা ও অধ্য( তা করলেন। বাংলার পাল রাজাদের আনুকূল্য লাভও হল।

ষাট-ছুঁইছুঁই বয়সে ধর্মপ্রচারের জন্য ডাক এলো সুদূর তিব্বত থেকে। চলে গেলেন নেপাল ও মানসসরোবর হয়ে পশ্চিম তিব্বতের তুষার রাজ্যে। তিন বছর পরে দেশে ফেরার চেষ্টা করলেন বটে তবে তা ব্যর্থ হল। তিব্বতেই থেকে গেলেন। মধ্য তিব্বতে ভ্রমণ ও ধর্মপ্রচার করে জীবনের অন্তিম তেরোটা বছর কাটিয়ে দিলেন সেই নিষিদ্ধ দেশেই। শেষনিঃশ্বাস নির্গত হল সেখানে। বাংলার সন্তানের বাংলার মাটিতে ফেরা হল না। তিনি রয়ে গেলেন বি(ের একজন মনীষী হয়ে।

ইতিহাসের বাংলাদেশে আরো কয়েকজন মহাজীবনের কথা জানা যায়। সমতট বংশীয় শীলভদ্র ছিলেন পাল-পূর্ব যুগের মহাজ্ঞানী বৌদ্ধপণ্ডিত। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বুদ্ধভদ্র যোগাচার বুদ্ধধর্মে প্রভূত বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি অবলোকিতে(র, মৈত্রেয় ও মঞ্জুশ্রীর কৃপাধন্য ছিলেন। সপ্তম শতকে চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ নালন্দায় এসে শীলভদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে আমরা শান্তর( িত ও কমলশীলের কথা জানতে পারি। এঁরাও বঙ্গ দেশের সুসন্তান। গিরি-তুষার লঙ্ঘন করে তিব্বতে ধর্মপ্রচারে গিয়েছিলেন। এঁদেরও জীবনাবসান হয় তিব্বতে। শান্তর( িত বাংলাদেশের চন্দ্রবংশের সন্তান বলে দাবী করা হয়। তিব্বতের রাজা তাঁকেও আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন সেদেশে। পরে তিব্বতে ধর্মপ্রচারে গেলেন গুরু পদ্মসম্ভব লোপোন রিনপোচে।

সর্বশেষ ধর্মগুরু যিনি তিব্বতে পা রেখেছিলেন, সেখানে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়েছিলেন, তিনি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তবে ইনি কেবল তিব্বতে নয়, পাড়ি দিয়েছিলেন দূর দ্বীপদেশে। জীবন বিপন্ন করে যাত্রা করেছিলেন দুর্গম সুবর্ণভূমিতে। বোধিচিত্ত সম্পর্কে উচ্চশি( া লাভ করতে।

তাঁর স্মরণে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'আমরা' কবিতায় লিখেছেন,

বাঙালি অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,

জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে, বাঙালি দীপঙ্কর।

## ২। বিক্রমপুরের চন্দ্রগর্ভ

অবিভক্ত বাংলায় ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত বিক্রমপুর পরগনা অতি সুপরিচিত স্থান। বর্তমানে পরগনাটি মুন্সিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।

প্রাচীনকালে বৃহত্তর বাংলা নানা ক্ষুদ্র এলাকায় বিভক্ত ছিল — সমতট, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, রাঢ়, উপবঙ্গ ইত্যাদি। দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চল সুহ্ম নামে পরিচিত ছিল — প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর ছিল সুহ্মের অন্তর্ভুক্ত স্থান। বর্তমানের বর্ধমান জেলা ছিল রাঢ় অঞ্চলে। অজয় নদী রাঢ়-অঞ্চলকে উত্তর-দক্ষিণে বিভক্ত করেছে। সমতট বা বঙ্গদেশ ঢাকা অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। পুণ্ড্র ছিল উত্তরবঙ্গে — মহানন্দা-করতোয়া বিধৌত নদী-মাতৃক অঞ্চলে। তবে এই সমস্ত এলাকার নির্দিষ্ট কোন সীমানা ছিল না। ব্যপ্তিও নানা কালে নানা বর্ণনে বিপর্যস্ত হয়েছে।

সেদিনের অতীতে বঙ্গ জনপদের অন্তর্গত বিক্রমপুর নগর চন্দ্র-বর্মন-সেন বংশীয় রাজাদের রাজধানী হিসেবে গড়ে উঠেছিল। দশম থেকে ত্রয়োদশ শতক অবধি। নানাসূত্রে তার উল্লেখ মেলে। মোঘল আমলে বার ভূইয়াঁর মধ্যে দু'জন ভূইয়াঁ, চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের বিক্রমপুরে জমিদারী ছিল। পরগনাটি পশ্চিমে পদ্মা, উত্তরে ও পূর্বে ধলেশ্বরী এবং দক্ষিণে মেঘনা-আড়িয়ালখাঁ নদীর সঙ্গম পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যে প্রবাহিত কালিগঙ্গা নদী। পদ্মার তুমুল প্রবাহে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় বিক্রমপুরের চাঁদরায়-কেদারবায়ের জমিদারীতে। তারই জেরে পদ্মার আরেক নাম হয় কীর্তিনাশা।

বিক্রমপুর পরগনায় বজ্রযোগিনী নামে একটি গ্রাম আছে। নাম থেকে প্রতিভাত হয়, গ্রামখানি যোগিনীচর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল।

বজ্রযোগিনী নামে মহাযানী বৌদ্ধদের রত্নসম্ভব কুলের এক দেবী আছেন। ইনি হিন্দুদের ছিন্নমস্তার মতো। পীতবর্ণা ও নগ্না। আপন মস্তক ডানহাতের কর্ত্রি দ্বারা কর্তিত করে বামহস্তে বক্ষ ধারণ করে থাকেন। কবন্ধ হতে নিঃসৃত রক্তধারা তাঁর কর্তিত মুখে প্রবেশ করে। বজ্রযোগিনী আরাধনার বিশেষ মন্ত্র আছে। এবং সেটি নাকি সিদ্ধমন্ত্র। তদর্থ — এক লক্ষ বার জপ করলে দেবী সিদ্ধ হন ও সাধকের সামনে আত্মপ্রকাশ করেন। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য 'বৌদ্ধদের দেবদেবী' গ্রন্থের পৃষ্ঠায় লিখেছেন সেই সিদ্ধমন্ত্রটি উপস্থাপিত করেছেন। মন্ত্রটি এইপ্রকার —

'ওঁ সর্ববুদ্ধডাকিনীয়ে ওঁ বজ্রবর্ণনীয়ে ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হূঁ হূঁ হূঁ ফট্ ফট্ ফট্ স্বাহা'।

মন্ত্রে বজ্রবৈরোচনীয়ে শব্দটি থাকায় অনেকের খটকা লাগতে পারে। কেননা তাহলে তিনি বৈরোচনকুলের তান্ত্রিক দেবী বজ্রবারাহী কিনা সে প্রশ্ন উঠে আসে। আমরা ঐ জটিলতায় প্রবেশ করবো না।



সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে বজ্রযোগিনী গ্রামের এক অভিজাত পরিবারে চন্দ্রগর্ভ নামে এক পুত্র জন্মে। পিতার নাম কল্যাণশ্রী (তিব্বতী নাম — গে-ভহি-পাল)। মাতার নাম প্রভাবতী বা শ্রীপ্রভা। এটি দম্পতির মধ্যম পুত্র। প্রথম পুত্রের নাম পদ্মগর্ভ। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীগর্ভ। নানা সূত্রে উপরোক্ত অভিজাত পরিবারটিকে গৌড় দেশের রাজপরিবার বলা হয়েছে। রাজপরিবার বলা হলেও তারা ঠিক গৌড়ের রাজা ছিলেন না।

তখন বঙ্গদেশে পাল বংশ রাজত্ব করছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে। গোপাল-ধর্মপাল-দেবপালের আমল ছিল প্রথম পর্যায়। কিছু পরে পরবর্তী পর্যায়ে গৌড়-মগধের রাজাসনে বসেন দ্বিতীয় বিগ্রহপাল অথবা তাঁর পুত্র মহীপাল-১। পাল রাজত্বকালটি নানা প্রসঙ্গে উঠে আসবে। তাই এই সময়কাল একটু বুঝে নেওয়া দরকার।

হর্ষবর্ধনের তিরোধান ৬৪৬ বা ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে। কিছুকাল পরে পালরাজাদের আমলে পুনরায় বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তবে তা প্রধানত মহাযান ধর্মের তান্ত্রিক মতবাদ। পালরাজাদের আগে বঙ্গদেশের একাংশে কিছুকাল খড়্গ রাজারা রাজত্ব করেন। রাজধানী ছিল কর্মান্ত যাকে কুমিল্লার নিকটবর্তী কামতা বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এরা বৌদ্ধ ছিলেন। তাম্রশাসনে কথিত যে ঢাকা ঐ খড়্গ রাজাদের দেশভুক্ত ছিল।

পূর্বভারতে পালরাজবংশের রাজত্বের শুরু গোপাল নামের একজন সামন্ত নৃপতিকে শাসন মতায় বসিয়ে। কেউ কেউ এ ঘটনা আনুমানিক ৬৫০ খৃষ্টাব্দের বললেও সম্ভবত তা ৭৫০ খৃষ্টাব্দের। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন, গোপালদেব ৭৮৫-৭৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজপদে অভিষিক্ত হন আর পাঁচ বছরের মধ্যে জীবনাবসান হয়। ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, গোপালদেবের সিংহাসনারোহণ ৭৩০-৭৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এবং দেহাবসান ৮০০ খৃষ্টাব্দে। হিউয়েন সাঙের বিবরণে রাজা গোপালের উল্লেখ নেই। গোপালের পরে সিংহাসনে বসেন পুত্র ধর্মপাল। কেউ কেউ ধর্মপালের রাজত্বকাল ৭৮১-৮২১ খৃষ্টাব্দ বলেছেন।

'গৌড়ের ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে গোপালের রাজত্বকাল ৭৭৫-৭৮৫ খৃষ্টাব্দ এবং ধর্মপালের রাজত্বকাল পরবর্তী পঁয়ত্রিশ বৎসর। রমেশচন্দ্র মজুমদার, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও কালিকিঙ্কর দত্তের মতে ধর্মপালের কাল ৭৮০-৮১৫ খৃষ্টাব্দ। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া 'বাংলায় বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থে ধর্মপালের রাজত্বকাল ৭৭০-৮১০ খৃষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। ধর্মপালের পরে পুত্র দেবপাল রাজত্ব করেন। তারপর পালরাজবংশ অধোগতিপ্রাপ্ত হয়। কিছুকাল পরে প্রথম মহীপালের সময় হৃতগৌরব কিঞ্চিৎ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর রাজত্বকাল নিয়েও প্রবল মতভেদ আছে।

ভিনসেন্ট স্মিথের মতে প্রথম মহীপালের রাজত্বকাল আনুমানিক ৯৭৮-১০৩০ খৃষ্টাব্দ। 'গৌড়ের ইতিহাস' অনুসারে তাঁর রাজত্বকাল ৯৮০-১০৩৬ খৃষ্টাব্দ। অলকা চট্টোপাধ্যায়

বলেছেন ৯৮৮-১০৩৮ খৃষ্টাব্দ। স্বা( রতা প্রকাশন প্রকাশিত 'বি(েকোষে' ধরা হয়েছে একই সময়কাল। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের মতে, তাঁর রাজত্বকালের শুরু খৃষ্টীয় দশম শতকে এবং অন্তিমকাল ১০২৫ খৃষ্টাব্দে। রমেশচন্দ্র মজুমদার-হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী-কালিকিঙ্কর দত্ত বলেছেন, প্রথম মহীপালের রাজত্বকাল একাদশ শতকের প্রথম সিকিতে। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথের মতে মহীপাল-১ বাহান্ন বৎসর রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেউ কেউ বলেন রাজা প্রথম মহীপালের রাজত্বকাল ৯৯৫-১০৪৩ খৃষ্টাব্দ। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, বগুড়া ও ত্রিহুতে বিস্তৃত ছিল পালসাম্রাজ্য। হয়তো প্রাচীন মগধ, বিদেহ ও পুণ্ড্ররাজ্যও পালরাজাদের দখলে ছিল।

বৌদ্ধতীর্থ সারনাথে রাজা মহীপাল তাঁর অনুজ বসন্তপাল ও আরেক আত্মীয় স্থিরপালের সাহায্যে ধর্মচক্র( পুনর্ভব, শৈলরাজ কুট্টিম ও ধর্মরাজিক সংঘ স্থাপন করেন ও প্রাচীন স্তম্ভের সংস্কার করেন। কাশিতে একশত ঈশান দীপস্তম্ভ ও চিত্রঘন্টা স্থাপন করেন। আবার সংঘকোটে দ( িণ ভারতের রাজা রাজেন্দ্রচোল নাকি মহীপাল নামের এক রাজাকে পরাস্ত করেন। ইনি মগধের রাজা মহীপালই হবেন। এ ঘটনা ১০১২ অথবা ১০২৩ খৃষ্টাব্দের। পালরাজাদের কথায় আবার পরে আসা যাবে।

শরৎ চন্দ্র দাসের তথ্য অনুসারে, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান উত্তর জীবনে বলেছিলেন যে তখন বাংগলায় 'ভূ ইন্দ্র চন্দ্র' নামক রাজার আমল ছিল। ঐ রাজার রাজ্যসীমা পরিত্র(ম করতে কোন হস্তিনীর সাতদিন সময় লাগত।

এমন কথা সত্যি অতীশ বলেছিলেন কিনা তা যাচাই করার উপায় নেই। বাংলার ইতিহাসে ঐ নামে কোন রাজার অস্তিত্ব জানা নেই। তবে চন্দ্র রাজারা সত্যিই রাজত্ব করেছেন পূর্ব এবং দ( িণ বাংলায় — তাঁদের রাজধানী ছিল কুমিল্লার কাছে। ছয়জন চন্দ্র বংশীয় রাজা ৯০০ থেকে ১০৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করে গিয়েছেন। তাদের আমলে বঙ্গে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সুদৃঢ় হয়েছিল। এ বিষয়ে চন্দ্রবংশীয় রাজা গোপীচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে। অনেকের মতে, দশম-একাদশ শতকে ঢাকা বিত্র(মপুর এলাকায় চন্দ্র বংশীয় বৌদ্ধ রাজারা রাজত্ব করেন। অতীশ দীপঙ্করকে কেউ কেউ চন্দ্রবংশীয় সন্তান বলে থাকে।

উত্তর জীবনে অতীশ দীপঙ্কর তাঁর এক ঘনিষ্ট তিব্বতী শিষ্যকে বলেছিলেন — ভারতে প্রকৃত রাজা ও রাজবংশীয় এমন দুই শ্রেণির মানুষ আছে। প্রকৃত রাজা রাজ্যশাসন করেন। রাজবংশীয়রা করেন না। আমার জন্ম রাজবংশীয় কুলে। পিতা ছিলেন গৃহী উপাসক — মহাবোধিসত্ত্ব।

তিব্বতী ইতিহাসে কথিত আছে — (দীপঙ্কর) পূর্বভারতের সাহোরে বিত্র(মপুর নগরকেন্দ্রে স্বর্ণধ্বজ-বিশিষ্ট প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শান্তিজীবও



সেই মহান বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আচার্য শান্তিজীব বলতে শান্তর( তকেই বোঝায়। তিনিও নাকি বাংলার চন্দ্রবংশে তিনশত বৎসর পূর্বে জন্মলাভ করেন। আমরা তাহলে একই বংশে দু'জন মহাপণ্ডিত বঙ্গসন্তানের দর্শন পাই।

পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে দীপঙ্করের জন্ম বিহারের ভাগলপুরে। তাঁর মতে সহোর ও ভাগলপুর ছিল একই জায়গায়। মুসলমান আমলে ভাগলপুর জেলার দ( িণাঞ্চল সহোর বা ভাগল নামে পরিচিত ছিল। সহোর ছিল এক মাণ্ডলিক বা সামন্ত রাজ্য।

তিব্বতী ইতিহাস অনুসারে অতীশের পিতা ছিলেন 'জাহোর'এর রাজা। জাহোর মানে সম্ভবত সাহোর। তা লাহোর থেকে জাত না যশোর থেকে, নাকি ঢাকার সমীপবর্তী সাভার নামক স্থান থেকে — বলা কঠিন। তবে 'জাহোর' বা 'সাহোর' যদি 'শহর' শব্দ থেকে গঠিত হয়ে থাকে তবে বাংলার দাবী আরো জোরালো হয়।

দীপঙ্করের জন্মস্থান ঢাকা বিত্র(মপুরের বজ্রযোগিনী গ্রাম — অধিকাংশ পণ্ডিত এই তথ্যটিই গ্রহণ করেছেন। লোকপ্রবাদের যদি কোন বাস্তব ভিত্তি থাকে, তবে বিত্র(মপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে এখনো কোন এক মাটির স্তূপকে 'অতীশের ভিটে', 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটে' ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। বৌদ্ধরা ঈ(রের অস্তিত্বে ভরসা করেন না। তাই তারা নাস্তিক। দীপঙ্করও নাস্তিক পণ্ডিত কথিত হবেন এ আর এমন বিচিত্র কী! ঐ ভিটের কাছে সত্যি সত্যি এক বিরাট মাটির ঢিপি ও তিনটি পুকুর আছে। খননকালে দালানের ভগ্নাবশেষ ও কিছু জিনিস পাওয়া যায়। জিনিসগুলি হারিয়ে গিয়েছে।

কল্যাণশ্রীর মধ্যম পুত্র চন্দ্রগর্ভ উত্তরকালে 'অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' নামে খ্যাত হয়েছেন। তিব্বতীরা তাঁকে জোবো, জোবোজে নাম গ্রহণ করেছে। অতীশ বা অতীশা নামকরণও তাদের।

ইতিহাসে শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধের মহাপ্রয়াণ ঘটে ৪৮৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পরে (প্রকৃতপ( ১৪৬৫ বৎসর পরে) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম হয়। ৯৮২ খৃষ্টাব্দে। অনেকের মতে অতীশের জন্ম হয় ৯৮০ খৃষ্টাব্দে। যেমন শশীভূষণ দাশগুপ্তর মতে দীপঙ্করের জীবনকাল ৯৮০ থেকে ১০৫৬ খৃষ্টাব্দ।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের বেশ খানিকটা অংশ তিব্বতী সূত্র থেকে সংগৃহীত। বিশেষ করে বুদ্ধ-পরবর্তী বৌদ্ধধর্ম, তীর্থ, বিহার ও বৌদ্ধপণ্ডিতদের প্রসঙ্গে। সেখানে বলা হয়েছে তিব্বতী পঞ্জিকার 'জল-পুং-অ(ে বর্ষে' তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কোন সংখ্যার উল্লেখ নেই। এরকম অদ্ভুত প্রকার বর্ণনের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

তিব্বতী পঞ্জিকা অনুসারে ষাট বছরে কালচক্র(র আবর্তন হয়। এরকম বর্ষ বর্ণনা শুরু হয়েছে ১০২৭ খৃষ্টাব্দে যখন 'বিমলপ্রভা' নামে কালচক্র(-টীকাগ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। অন্য নাম 'কালচক্র(তন্ত্র রাজটীকা'। রচয়িতার নাম সুচন্দ্র। তখন থেকে

বৎসরের নাম রাখা হয় পাঁচটি ভৌত পদার্থ — মৃত্তিকা, লৌহ, জল, কাষ্ঠ ও অগ্নির নামে। এবং এই ভৌত নামের সঙ্গে বারোটি প্রাণী — কুকুর, শূকর, ইঁদুর, ষাঁড়, বাঘ, শশক, মকর, সর্প, অশ্ব, ভেড়া, বানর ও পাখির নাম যুক্ত করে। প্রত্যেক মৌল পদার্থ দু'বার করে গণনা করা হবে — একবার পুংলিঙ্গে, আরেকবার স্ত্রীলিঙ্গে। এভাবে দশ বৎসরে মৌল পদার্থগুলির গণনা শেষ হয়ে যাবে। বারো বৎসরে প্রাণীগুলির একদফার গণনা শেষ হবে। ফলে প্রথম মৌলটি একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যক প্রাণীর সঙ্গে যুক্ত করে গণনা করা হবে। যেমন, কাষ্ঠ-পুং-ইঁদুর, কাষ্ঠ-স্ত্রী-ষাঁড়, অগ্নি-পুং-বাঘ, অগ্নি-স্ত্রী-শশক ইত্যাদি। তদনুসারে ১০২৭ খৃষ্টাব্দকে 'অগ্নি-স্ত্রী-শশক বর্ষ' হিসেবে গণ্য করা শুরু হল।

এবম্বিধ ব্যাখ্যানে 'জল-পুং-অশ্ব বর্ষ' বলা হতে পারে ৯৮২ খৃষ্টাব্দকে। তাই অধিকাংশ পণ্ডিত ৯৮২ খৃষ্টাব্দকেই তাঁর জন্মকাল হিসেবে গ্রহণ করেন। আমরাও সেই সময়কাল অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি।

### জল-পুং-অশ্ব বর্ষ -- ৯৮২ খৃষ্টাব্দ

রাজন্যবর্গীয় কল্যাণশ্রী নাকি কুবেরের মতো ধনী ছিলেন। তাঁর ভবনকে বলা হত 'স্বর্ণধ্বজ' বা 'কাঞ্চনধবজ' যা নাকি নয় শত নিরানব্বুই স্বর্ণধ্বজার প্রাসাদ ছিল। সত্যি সত্যি প্রাসাদশীর্ষে নয় শত নিরানব্বুইটি স্বর্ণধবজা উড়ত নাকি!

অন্যত্র বলা হয়েছে — ঐ প্রাসাদের তেরোটি স্বর্ণময় ছাদ ছিল। একটির উপর আরেকটি। এবং সেখানে পঁচিশ হাজার পতাকা শোভা পেত। রাজভবনের পরিপার্শ্বে সাজানো ছিল অনেক জলাশয় ও সুশোভিত উদ্যান।

জন্মানোর পরে চন্দ্রগর্ভ যখন প্রাসাদের সর্বোচ্চ তলে শায়িত ছিলেন, তখন সংগীতের উচ্চস্বর ও ঢাকের আওয়াজ ভেসে এসেছিল। রাজা কল্যাণশ্রী বাইরে তাকিয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন। রানী প্রভাবতী দেখেছিলেন যে আকাশ থেকে সদ্য ফোটা শতদল এসে পড়ল সদ্যজাত শিশুটির কাছে। শিশুর মুখখানি মনে হচ্ছিল অনেকটা তারাদেবীর আদলে। অন্য বর্ণনায় ব্যক্ত — সেই সময় পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছিল আর আকাশে রামধনু দেখা দিয়েছিল।

নানা অলৌকিক কাণ্ডের কথা শুনে সকলের বিশ্বাস জন্মাল যে তারাদেবী কুমার চন্দ্রগর্ভের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। জন্মজন্মান্তরে তাঁর অনুগ্রহ বর্ষিত হয়ে চলেছে কুমারের উপর। গৃহী কল্যাণশ্রীর উপাস্য দেবীও আর্যতারা। ইনি পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধির শক্তিরূপিনী দেবী — তারা, তারিণী বা আর্যতারা। সিদ্ধি অমোঘ যে দেবতার বন্দনায় তিনিই অমোঘসিদ্ধি। এই কুলের দেবদেবীরা প্রধানত সবুজ বর্ণের হন।

শিশুর বয়স যখন আঠারো মাস, তখন পিতামাতা তাঁকে স্থানীয় কমলপুরী মন্দিরে পূজার জন্য নিয়ে যান। সেখানেই প্রথম প্রজাবৃন্দ মধ্যম রাজকুমারকে চাক্ষুষ দর্শন করল। উপাসনাকালে শিশুটি নিজে থেকেই মন্দিরের পবিত্র বস্তুসকল স্পর্শ করে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল।



বিশেষ যত্নের সঙ্গে রাজকুমার লালিত পালিত হতে লাগল। দিনে দিনে সে যতো বড়ো হয়, ততই সুন্দর হয়ে ওঠে। মনে হচ্ছে, পূর্বজন্মের অফুরান করুণা-দক্ষ মার কারণে প্রভূতপুণ্যকর্ম অর্জিত হয়েছিল। শিশুর অসামান্য সুদর্শন রূপ সেজন্যেই। চোখ ফেরানো যায় না এমন পুত্র অবশ্যই পিতামাতার গর্বের। রোগভোগের বালাই নেই। সকলেই তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিও সকলের প্রশংসা অর্জন করছিল। কল্যাণশ্রী তাঁকেই উত্তরাধিকার করবেন ভাবছিলেন। ক্ষুদ্র জমিদারী রাজ্যের শাসনক্ষমতার অধিকারী করে যাবেন স্থির করছিলেন। এদিকে অলক্ষ্যে কুমারের মনে তখন অন্য ভাবের সঞ্চার হচ্ছে। সংসার নয়, সন্ন্যাস দানা বাঁধছে। তিনি ভিক্ষু সন্ন্যাসী হবেন ভাবছেন।

তখনকার রীতি অনুসারে তাঁর যখন এগারো বৎসর বয়স, পরিবারের লোকজন বিবাহের আয়োজন শুরু করেছিল। সুদর্শন রাজকুমার। ধনী পরিবার। উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া কঠিন ছিল না।

একরাতে তারাদেবী স্বপ্নে দেখা দিয়ে কুমার চন্দ্রগর্ভকে বললেন — শোন পুত্র, গত পাঁচশত জন্মে তুমি ছিলে ভিক্ষু-সন্ন্যাসী। সংসারের ভোগবিলাস এসব তোমার জন্য নয়। একজন সাধারণ সংসারী মানুষকে বিলাসবহুল জীবনের পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার করা সহজ — চোরাবালি থেকে ছাগশিশু উদ্ধারের মতো। কিন্তু রাজপরিবারের এক সদস্যকে উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন — চোরাবালি থেকে হস্তী উদ্ধারের মতো।

কিশোর চন্দ্রগর্ভ গভীর ভাবনায় পড়ে গেলেন। স্বপ্নের কথা কারো কাছে প্রকাশ করলেন না। কৌশলে বিবাহের উদ্যোগ বন্ধ করার ব্যবস্থা করলেন। বিবাহ হল না। এ তথ্যের বিপরীতে কোন কোন সূত্রে তাঁকে বিবাহিত ও কয়েক সন্তানের জনক বলা হয়েছে।

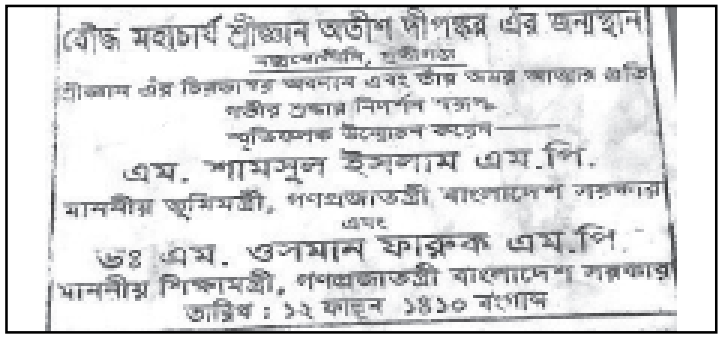




চিত্র-১ বাংলাদেশের ব্রজযোগিনী গ্রামে স্মৃতিফলক

## ৩। তান্ত্রিক গুহ্যজ্ঞানবজ্র

রাজকুলের নিয়মানুসারে বালক চন্দ্রগর্ভ বিদ্যাভ্যাস করতে লাগলেন। আরোগ্য-বিধি রপ্ত করলেন। নানা সুকুমার শিল্পের চর্চা করলেন। তখন তাঁর বয়স দশ বৎসর।

অতীশের মাতা ব্রাহ্মণ-কন্যা। তাঁর কাছেই মধ্যম পুত্রের বেদাদি শি(ার সূত্রপাত হয়েছে — এরকম কথা প্রচলিত আছে। পরবর্তীকালের তিব্বতী সূত্র অবশ্য এই তথ্যটি গ্রহণ করে নি।

বাংলাদেশ ভি( মহাসভার মতে, তিনি বাল্যশি(া লাভ করেছিলেন ঢাকার কাছে আসরাফপুরে অবস্থিত বজ্রাসন বিহারে।

বাল্য বয়সেই কুমারের মনে জাগ্রত হয়েছে গৃহত্যাগের বাসনা। চন্দ্রগর্ভ সেই ইচ্ছা কার্যকর করতে উদ্যোগী হলেন। একদিন পিতা কল্যাণশ্রীকে শিকারে যাওয়ার বাসনার কথা জানালেন। রাজকুমারের শিকারযাত্রা অতি স্বাভাবিক ঘটনা। খুশিমনে পিতা ব্যবস্থা করে দিলেন। মনেমনে ভাবলেন — যাক তবু কুমারের মন সমসারমুখী হয়েছে। একশত ত্রিশ জন অশ্বারোহী সাথী নিয়ে মধ্যমকুমার অরণ্যে যাত্রা করবেন। শিকার ও আমোদ করতে। শেষ পর্যন্ত কত পশুশিকার করা হল কে জানে! আমোদপ্রমোদও হয়তো হচ্ছিল। ইতিমধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটল। গভীর অরণ্যে কুমার চন্দ্রগর্ভের সঙ্গে সা(াত হয়ে গেল এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের। নাম আচার্য জেতারি। তাঁর গুণরাশির কথা আগেই শুনেছিলেন। সা(াতলাভে মুগ্ধ চন্দ্রগর্ভ কুটীরবাসী আচার্যের কাছে উপদেশ প্রার্থনা করলেন। পণ্ডিত জেতারি মানব জীবনের অভিমুখ সম্পর্কে উপদেশ দান করলেন। কুমারের আত্যন্তিক আগ্রহ দেখে বিস্মিত আচার্যদেব তাঁকে বললেন — বৎস, তোমার সদিচ্ছা দেখে প্রীত হলাম। সত্যি যদি আরো জ্ঞানলাভ করতে চাও, তবে নালন্দায় আধ্যাত্মিক গুরু আচার্য বোধিভদ্র আছেন, তাঁর কাছে চলে যাও।

কুমার চন্দ্রগর্ভ গৃহে ফিরে গেলেন না। বিত্র(মপুর থেকে চলে গেলেন বিহার রাজ্যের নালন্দায়। আচার্য বোধিভদ্রের সঙ্গে দেখা করে তাঁর উপদেশ লাভ করতে। তিনি খোঁজ দিলেন আরেক পণ্ডিতের। নাম বিদ্যাকোকিল। তাঁর শরণাপন্ন হতে পরামর্শ দিলেন। সেখানে গিয়েছিলেন কিনা জানা নেই। পৌঁছে গেলেন আচার্য অবধূতিপার কাছে।

আসলে কুমারের শি(াদী(ার পর্ব নিয়ে নানা কাহিনী আছে। সুপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন এই ঘটনা কিভাবে বর্ণনা করেছেন দেখা যাক।

কিশোর চন্দ্রগর্ভ ঘুরতে ঘুরতে একবার অরণ্যের ভিতরে প্রবেশ করেন। সেখানে এক পাহাড়ে গিয়ে শুনলেন কুটিরবাসী আচার্য জেতারির কথা। ইনি ব্যাকারণবিৎ মহাপণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে দেখা হল। আচার্য তাঁকে প্রশ্ন করেন — তুমি কে?



কিশোর উত্তরে বলেন — আমি এখানকার রাজপুত্র।

আচার্যদেব কিশোরের জবাবে দর্পের প্রকাশ ল( করে প্রীত হলেন না। মহাবৈরাগী বললেন — এখানে আমাদের কোন রাজা নেই, রাজপুত্র থাকার প্রশ্নও নেই। আমার কোন প্রভু নেই। আমিও কারো প্রভু নই। যদি এখানকার শাসক হও, তবে অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাও।

লজ্জিত হয়ে কুমার চন্দ্রগর্ভ বিনীতভাবে বললেন — আচার্যদেব, ভুল বুঝবেন না। আমি ইহসংসার ত্যাগ করতে চাই।

আচার্য জেতারি তখন তাঁকে নালন্দা যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আসলে মনে মনে ভাবলেন — রাজকুমারের মধ্যে ভূস্বামীর পুত্র হওয়ার জন্য ঐশ্বর্যের গর্ব আছে। তার নাশ করতে হবে। সেজন্য পিতার বিলাসবহুল আশ্রয় থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়।

আরেকটি সূত্র অন্যরকম বলেছে। 'নাগসো'র তথ্যের উপর ভিত্তি করে স্বনামধন্য পরিব্রাজক-ঐতিহাসিক শরৎ চন্দ্র দাস লিখেছেন — চন্দ্রগর্ভকে খুব অল্প বয়সে তাঁর পিতামাতা অবধূত জেতারির কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর কাছে তিনি পাঁচ প্রকার প্রাথমিক বিজ্ঞানশাস্ত্র শি(া করেন। এর ফলে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে কুমারের গভীরতর জ্ঞানলাভের সুযোগ উন্মুক্ত( হয়।

কেউ কেউ বলেন — এগারো বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে উপযুক্ত( গুরুর সন্ধানে ঘুরতে থাকেন। অবশেষে কোন এক অরণ্যে এমন একজন তন্ত্রগুরুর দেখা পান, যাঁর উপর তাঁর বিশ্বাস ও নির্ভরতা জন্মায়। সেই তন্ত্রগুরুই হলেন আচার্য জেতারি। তিনি চন্দ্রগর্ভকে নালন্দায় যাওয়ার সুপরামর্শ দিলেন।

রজনী কান্ত চত্র(বর্তী জেতারিমুনি নামে একজন বৌদ্ধভি(ুর কথা বলেছেন যিনি বিত্র(মশীল বিহারে সত্র (হোস্টেল) স্থাপন করেছিলেন। ইনি বরেন্দ্রভূমির সনাতন নামক রাজার পুত্র। আনুমানিক ৯০০ খৃষ্টাব্দে উক্ত( জেতারিমুনি রাজা মহীপালের স্বা( রিত প্রশংসাপত্র ও পণ্ডিত উপাধি লাভ করেন। আলোচ্য কাহিনীর আচার্য জেতারি ও উপরোক্ত( জেতারিমুনি একই ব্যক্তি( কিনা প্রশ্ন আছে। অন্যত্র আবার লেখক যখন বলেন মহীপালের রাজত্বকাল ৯৮০-১০৩৬ খৃষ্টাব্দ, তখন সময়ের হিসেব নিয়ে একটা গোল বাঁধে। কেননা সে( ত্রে ৯০০ খৃষ্টাব্দে জেতারিমুনি রাজা মহীপালের স্বা( রিত প্রশংসাপত্র ও পণ্ডিত উপাধি লাভ করেন কী করে!

তিব্বতী পণ্ডিত-ঐতিহাসিক তারানাথ এক আচার্য জেতারি সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেছেন — রাজা মহীপালের দুই পুরুষ পরে রাজা বনপালের সময় পূর্বদিকে বরেন্দ্রভূমিতে সনাতন নামে এক সামন্তরাজা ছিলেন। রাজার প্রধানা মহিষী ছিলেন অতি রূপবতী। রাজা বনপাল যখন ব্রাহ্মণ আচার্য গর্ভপাদের নিকট গুহ্যসমাজে অভিষেক-দী(া গ্রহণ করেন, তখন মূল্যস্বরূপ বিবিধ দানের সঙ্গে মহিষীকেও দান করেন। ঐ মহিষীর

গর্ভে আচার্য গর্ভপাদের পুত্র জেতারির জন্ম হয়। সাত বৎসর বয়সে পিতার কাছে তাঁর 'মঞ্জুঘোষ-অভিষেক' ক্রি(য়া সম্পন্ন হয়। তারপর তিনি ধ্যানে মগ্ন হন ও 'শুদ্ধ-প্রতিভাষ-সমাধি' লাভে প্রয়াসী হন। সিদ্ধিলাভ তাঁর যখন প্রায় সমাসন্ন, ধ্যানসাধনায় বিঘ্ন ঘটে। ফলে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ অধরা থেকে যায়। ললিতকলা ও শব্দবিদ্যা তাঁর বিশেষ আয়ত্তাধীন ছিল। আরো নানা শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। গুহ্যসমাজ, চক্র(সম্বর, হেবজ্র ইত্যাদি তান্ত্রিক বিষয়ে ইনি বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। বোধিসত্ত্ব 'মঞ্জুঘোষ' স্বয়ং নাকি তাঁকে তত্ত্বজ্ঞান দান করেন।

শোনা যায় প্রথমে তাঁকে 'পত্র' তথা 'পণ্ডিত' উপাধি দেওয়া হয়নি। পরে রাজা মহীপালের রাজত্বকালে তিনি বিক্র(মশীল বিহারের পণ্ডিত পদে বৃত হন। ইনি 'শি( া-সমুচ্চয়', 'চর্যাবতার', 'আকাশগর্ভসূত্র' ইত্যাদির উপর টীকা ও অনেক সূত্র-তন্ত্রের উপর শাস্ত্র রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন। 'শি( াসমুচ্চয়' ও 'বোধিচর্যাবতার' আচার্য শান্তিদেব রচিত মহাযান গ্রন্থ যি নি সপ্তম শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন।

মঞ্জুঘোষ বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর এক রূপ। স্বর্ণকায় মঞ্জুশ্রী পরাবিদ্যা ও পরাজ্ঞানের দেবতা। দ( ণ হস্তের অসি দ্বারা অবিদ্যা-অজ্ঞানতা ছেদ করেন ও বাম হস্তে ধৃত প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক দ্বারা পরাজ্ঞানের প্রচার করেন। বোধিসত্ত্ব মঞ্জুঘোষ একমুখবিশিষ্ট ও দ্বিভুজ রূপে চিত্রিত। সিংহবাহনে উপবেশন করে হস্তদ্বয়ে রচিত ব্যাখ্যান মুদ্রায় ধর্মচক্র( মুদ্রা প্রদর্শন করেন। তাঁর বাম পার্শ্বে উৎপল থাকে। দ( ণ পার্শ্বে সুধনকুমার ও বামপার্শ্বে যমান্তক দণ্ডায়মান।

কারো কারো মত, কুমার চন্দ্রগর্ভ গুরু জেতারির নিকট বর্ণমালা ও সাধারণ শি( াদী( া লাভ করেছিলেন। তবে জেতারি বিশিষ্ট ব্যাকারণবিদ ছিলেন। সেকারণে তাঁর কাছে কুমারের পর্যাপ্ত ব্যাকারণ-শি( ালাভ হয়েছিল এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। আরেক দলের মত — আচার্য জেতারির কাছ থেকে তিনি তন্ত্রবিদ্যাও গ্রহণ করেছিলেন।

এমনও হতে পারে গুরু জেতারির নিকট প্রাথমিক শি( ালাভের পরে কুমার চন্দ্রগর্ভ তন্ত্রচর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি তন্ত্রশি( া ও তন্ত্রচর্চা শুরু করেন গুরু জেতারির কাছেই। তারপর অন্য গুরুর কাছে শি( ালাভ করেন।

কেউ কেউ বলেন — পিতা কল্যাণশ্রী মধ্যমপুত্র চন্দ্রপ্রভকে তারাদেবীর মন্দিরে তন্ত্রমতে দী( াদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

কারো কারো মতে তাঁর পিতা কল্যাণশ্রী স্বয়ং তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি মাতৃ-শ্রেণির তান্ত্রিক আচার পালন করতেন। তাঁর হাতেই বাল্যবয়সে মধ্যমকুমারের তন্ত্রধর্মে অভিষেক ক্রি(য়া সম্পন্ন হয়। অতীশের তিব্বতী শিষ্য মহাযোগী, নল-বায়োর-পা-চেন-পো, বলেছেন —গুরু অতীশ একবার বলেছিলেন যে তাঁর তান্ত্রিক দী( া হয়েছিল পিতার কাছে। অতীশের মাতৃদেবী ব্রাহ্মণকন্যা — তাঁর কাছে চন্দ্রগর্ভ বেদ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন।



দেখা যাচ্ছে কোন কথাই সুনিশ্চিত বলা যায় না। প্রাথমিক শি( ালাভের পর তাঁর তন্ত্রশি( া হতে থাকে। শুরু কিভাবে কার কাছে তা নিয়ে নানাজনের নানা মত।

অতীশের একান্ত অনুগত শিষ্য ও সহচর নাগসোর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ১২৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে 'ফায়াগ-সোর-পা' অতীশের জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেন। শরৎ চন্দ্র দাস সেই গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন। সেখানে প্রাথমিক শি( াগুরু হিসেবে জেতারির উল্লেখ আছে। তাঁর কাছে পাঁচ রকমের লঘু-বিজ্ঞান শি( ালাভের কথা আছে। পরে চার হীনযানী শ্রাবক সম্প্রদায়ের ত্রিপিঠক, বৈশেষিক দর্শন, মহাযানী ত্রিপিঠক, মাধ্যমিক ও যোগাচার সম্প্রদায়ের অধিবিদ্যা এবং চার প্রকার তন্ত্র শি( ালাভ করেন।

ল( ্যনীয়, উপরোক্ত( তালিকার মধ্যে বৈশেষিক দর্শন বৌদ্ধসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত( নয়। ভারতীয় দার্শনিক ভাবধারায় প্রচলিত ষড়দর্শনের মধ্যে অন্যতম কণাদের বৈশেষিক দর্শন। শি( া-তালিকায় এমন দর্শনের উল্লেখ বিস্ময়কর। যেভাবেই হোক না কেন কুমার চন্দ্রগর্ভ ব্যাকারণ, থেরবাদ ও মহাযান মতবাদ, তার সঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্র-সম্মত শি( াদি আহরণ করেছিলেন। উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন তর্কবিদ্যা এবং দর্শনশাস্ত্রেও। প্রমাণ পাওয়া গেল পণ্ডিত নামে খ্যাত এক বিধর্মী ব্যক্তি(র বিরুদ্ধে মুক্ত(মঞ্চে জোরালো তর্ক করে তাঁকে পরাস্ত করার ঘটনা থেকে।

সুমপা আবার দীপঙ্করের গুরু হিসেবে আচার্য জেতারির নাম উল্লেখই করেননি। সেখানে গুরু হিসেবে যাদের নাম বলা হয়েছে, তাঁরা হলেন রাহুলগুপ্ত, শীলর( িত, ধর্মর( িত, ধর্মকীর্তি, শান্তিপা, নারোপা, কনিষ্ঠ কুশলীপা, অবধূতিপা এবং ডোম্বিপা।

গোস লোসাব অনুসারেও রাহুলগুহ্যবজ্র, অবধূতিপা, শীলর( িত, ধর্মর( িত, রত্নাকরশান্তি ও ধর্মকীর্তির নাম শি( ক হিসেবে পাওয়া যায়। এছাড়া আরো চৌদ্দ জন শি( কের নাম করা হয়েছে। সেখানে অবশ্য গুরু জেতারির নাম উল্লিখিত হয়েছে।

কে কে তাঁর গুরু ছিলেন আর কে ছিলেন না, পরস্পরবিরোধী এই সব দাবীর মধ্যে জটিলতার জাল খুলুন পণ্ডিতেরা। আমরা কাহিনীর সূত্রে ফিরে যাই।

কুমার চন্দ্রগর্ভ তখন আচার্য অবধূতিপা-র আশ্রয়ে। আচার্যদেব তাঁকে বললেন — বৎস, তুমি ঘরে ফিরে যাও। পরিবারের সকলের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার কোরো। একই সঙ্গে জীবনে ভোগবিলাসের মন্দ দিকগুলি ঠিক কী, সেসব দেখেশুনে নাও। তারপর ইচ্ছা করলে এসো আমার কাছে।

কুমার বজ্রযোগিনীর রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। পিতামাতা সন্তানের প্রত্যাবর্তনে আনন্দিত। ভাবলেন তাদের বিপথগামী মধ্যম পুত্রটির সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। এখন বুঝি বিবাহ করে সংসারধর্ম পালন করবে। অচিরে চন্দ্রগর্ভ তাঁদের সে ভুল ভাঙিয়ে দিলেন। তিনি উপযুক্ত( গুরুর সন্ধানে গৃহত্যাগ করেছিলেন। সংসার নয়, তাঁর একান্ত মনোবাসনা

নির্জনে বসে ধ্যান করা। এজন্যে পিতামাতার অনুমতি প্রার্থনা করতে এসেছেন। পিতা কল্যাণশ্রী তাঁকে বললেন — পুত্র, সেকাজ তো ঘরে বসেও হতে পারে। দরকার হলে বিহার নির্মাণ করে দেব। দরিদ্রদের প্রাণ খুলে দানধ্যান করতে পারো সেই বিহারে বসে। জঙ্গলে ফিরে যাওয়ার তো কোন দরকার নেই।

চন্দ্রগর্ভ উত্তরে বললেন — পিতা, আমার কাছে এই স্বর্ণপ্রাসাদ কারাগারের তুল্য। যে রাজকুমারীকে আমার বিবাহের জন্য পছন্দ করতে চাইছেন, সে দানব-কন্যা ব্যতীত পৃথক কিছু নয়। যে মিষ্ট খাদ্যসম্ভার তুলে দিচ্ছেন আমাকে, তা কুকুরের গলিত মাংস ছাড়া অন্য কিছু ভাবি না। যে রেশমি পোষাক ও অলঙ্কার আমার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তা নোংরার ঢিপি থেকে সংগ্রহ করা ছিন্নবস্ত্র থেকে অন্য কিছু নয়। আমি অরণ্যে বাস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আচার্য অবধূতিপার পদতলে বসে শি(া লাভ করতে আগ্রহী। আপনারা অনুমতি করুন। বিদায়কালে আমি কেবল আপনার কাছে দুধ, মধু এবং গুড় প্রার্থনা করছি। দয়া করে তা মঞ্জুর করুন। তারপর এই সংসার থেকে আমি চিরকালের জন্য বিদায় নেবো।

অনাগ্রহীকে জোর করে গৃহস্থ করা যায় না। কুমার চন্দ্রগর্ভ প্রার্থিত দ্রব্যাদি নিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। তবু পিতার প( থেকে সুর(া বাহিনী পাঠানো হল তাঁর সঙ্গে। প্রায় জোর করে।

কুমার আচার্য অবধূতিপার নিকট পৌঁছলে তিনি তাঁকে কৃষ(পর্বতে গুরু রাহুলগুপ্তের কাছে পাঠালেন। বললেন — আগে তাঁর কাছে তন্ত্র শি(া করতে হবে।

অনেকের মত, গৃহত্যাগ করে চন্দ্রপ্রভ উপযুক্ত( গুরুর সন্ধানে ঘুরতে লাগলেন সেই বারো বছর বয়সে। ঘুরতে ঘুরতে কৃষ(গিরি (রি-নগ-পো) এলাকায় উপনীত হলেন। সেখানে রাহুলগুহ্যবজ্র (গ্য-কান-সং-বাই-দোর্জে) বা রাহুলগুপ্ত নামের এক তান্ত্রিক মহাযোগী বাস করতেন। চন্দ্রগর্ভ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। ঐ তান্ত্রিক মহাযোগী নাকি তাঁকে হেবজ্র-চক্রে( দী(া দিয়েছিলেন।

অ( াভ্য দেবকুলের দেবতা হেরুক যখন তাঁর শক্তি(র সঙ্গে বিরাজ করেন তখন তাঁর নাম হয় হেবজ্র। একক মূর্তিতে ইনি ভীষণদর্শন ও নীলবর্ণবিশিষ্ট। আরক্ত( বহিরাগত চ( । কেশপাশ অগ্নিশিখার মতো উর্দ্ধোত্থিত। শবের উপর বামপদ বিন্যাস করে দ( িণ পদ বামপদের উরুদেশে স্থাপন করে নৃত্যরত। হস্তে বজ্র ও রক্ত(পূর্ণ কপাল থাকে। পতাকাসহ খট্টাঙ্গ বিরাজ করে স্কন্ধে। এই হল বৌদ্ধদেবতা হেবজ্রের রূপ।

আচার্য রাহুলগুপ্তের কৃষ(গিরি নামক স্থানটির অবস্থান ঠিক কোথায় তা নির্ণীত হয়নি। কৃষ(গিরি দ( িণ ভারতে হতে পারে আবার বিহার প্রদেশের রাজগীরেও হতে পারে। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার মনে করেন কৃষ(গিরি আসলে মহারাষ্ট্রের কানহেরি। অনেকে বলেন, মগধের রাজগীরে অবস্থিত সাত পর্বতের মধ্যে একটির নাম কালশিলা



বা কালাপিনা বা কৃষ(গিরি। যদি তাই সত্য হয়, তবে বাংলাদেশ থেকে কৃষ(গিরির অবস্থান তেমন দূরে নয়। সুতরাং চন্দ্রগর্ভের প( রাজগৃহের কৃষ(গিরি পৌঁছে রাহুলগুপ্তকে গুরু হিসেবে লাভ করা অধিক বাস্তবসম্মত বলেই মনে হয়।

গুরু রাহুলগুপ্ত কুমার চন্দ্রগর্ভের নিষ্ঠা আরো যাচাই করতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। চার পুরুষ ও চার নারী শিষ্য-শিষ্যাকে রাজকুমারের সঙ্গে দিলেন। তারা মহাসিদ্ধের মতো স্বল্পবাস ও অস্থি-মালায় ভূষিত। কুমারকে সদলবলে বজ্রযোগিনী গ্রামের রাজপ্রাসাদে পাঠানো হল। অদ্ভুত বেশভূষায় সজ্জিত সঙ্গীসাথীদের নিয়ে চন্দ্রগর্ভ পিতার প্রাসাদে বাস করতে লাগলেন। বলা বাহুল্য রাজপরিবারে কুমার যতটা সমাদৃত, তাঁর আট সাথী তেমন সমাদরলাভ করলো না। বরঞ্চ তাদের আচার-আচরণ ও কর্কশ ব্যবহার অত্যন্ত বিসদৃশ ছিল। দিনে দিনে তারা গৃহস্থ প্রাসাদবাসীদের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছিল। নিরুপায় হয়ে সংসারী পিতা কল্যাণশ্রী কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন। তিন মাস পরে পুত্রকে উন্মাদ জ্ঞান করে রাজভবন ত্যাগ করে তাঁকে চলে যেতে বললেন। এবারের গৃহত্যাগ প্রকৃতপ( চিরবিদায় হয়ে গেল। চন্দ্রগর্ভের সঙ্গে পূর্বজীবনের সংসারবন্ধন এতদ্বারা চিরতরে ছিন্ন হল। সে ছেদ এমনই গভীর হয়েছিল যে সহস্রাধিক বৎসর পরেও চন্দ্রগর্ভের পূর্বকালীন সংসারজীবনের রহস্য ভেদ করা দুষ্কর হয়ে রইল।

শুরু হল সন্ন্যাসীকুমার চন্দ্রগর্ভের জীবনের নতুন অধ্যায়।

গুরু রাহুলগুহ্যবজ্র শিষ্যের সংসার জীবনের পূর্বনাম চন্দ্রগর্ভ বদলে নতুন নাম দিলেন — 'গুহ্যজ্ঞানবজ্র' বা 'জ্ঞানগুহ্যবজ্র'। তারপর কৃষ(গিরি বিহারে আচার্যের নিকট পাঠ গ্রহণ করতে লাগলেন। ধ্যানশাস্ত্র ও ত্রিশি(া গভীরভাবে অধ্যয়ন করলেন। ত্রিশি(া বলতে নীতিশাস্ত্র, ধ্যান ও দিব্যজ্ঞান। কতদিন রাহুলগুপ্ত তাঁর গুরু ছিলেন জানা যায়নি।

তন্ত্রমতের গুহ্যজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহের অভিমুখ ছিল গোড়া থেকেই। বজ্রযান মতে 'বজ্র' হল শূন্য যা সৃষ্টির আদি কারণ। তাই আদিবুদ্ধ বজ্রধর। সৃষ্টির সর্ববিধ বস্তুসামগ্রী স্বভাবশুদ্ধ শূন্যরূপ নিঃস্বভাব ও বুদবুদের মতো গণ্য। শূন্য তথা বজ্রই নিত্য। বৌদ্ধদেবকুলে অনেক দেবতাই প্রতীক স্বরূপ হস্তে বজ্র ধারণ করে থাকেন।

'জ্ঞানগুহ্য' নামের একজন পণ্ডিতের অনুবাদ-করা পনেরোখানি গ্রন্থ আছে। একথা 'তাঙ্গুর'-এ উল্লিখিত আছে। ইনি প্রথম জীবনের অতীশ দীপঙ্কর কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। সম্ভবত ইনি অন্য কোন ব্যক্তি( হবেন।

তিব্বতী লেখক গোস লোসাব বলেছেন — বাল্যবয়সে একবার কুলদেবী আর্যতারা তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়েছিলেন( তাঁরই প্রভাবে রাজকীয় ঐশ্বর্য ও ( মতার প্রতি কুমারের জাগতিক বিতৃষ(া জন্মে।

গোস লোসাব আরো বলেছেন — তান্ত্রিক মতবাদে 'উৎপন্নক্র(ম' ও 'সম্পন্নক্র(ম' অবধি তিনি শি(া লাভ করেছিলেন। তারপরে বিদেশযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। সাত বৎসর

তিনি আচার্য অবধূতিপা বা অদ্বয়বজ্রের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তিন বৎসর তিনি কঠিন চিন্তাভাবনায় মগ্ন ছিলেন। তখন বিবিধ মননশীল বিষয় নিয়ে চর্চা করেন। কথিত আছে, ইনি উড্ডিয়ানে ডাকিনীদের সঙ্গে তান্ত্রিক ভোজ 'গণচত্র('তে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবং অনেক গুপ্ত বজ্রগীত শ্রবণ করেন।

গোস লোসাব এখানে দীপঙ্করের বিদেশযাত্রা বলতে ঠিক কি জানাতে চেয়েছেন, তা বোঝা গেল না। এই বিদেশযাত্রার অর্থ কি তাঁর দ(ি ণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত সুবর্ণদ্বীপে যাত্রা? আমরা জানি, ১০১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সুবর্ণদ্বীপ যাত্রা করেছিলেন। সাত সাতটি বৎসর আচার্য অবধূতিপার সাহচর্য লাভের পরে।

অন্য সূত্র মতে গৃহত্যাগী চন্দ্রগর্ভ গুরু অবধূতিপার নিকট ফিরে গিয়ে তাঁর কাছে একুশ থেকে পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত শি(ালাভ করেন। দীপঙ্করের জন্ম ৯৮২ খৃষ্টাব্দ ধরা হলে শি(ালাভ করেন ১০০৭ খৃষ্টাব্দ অবধি।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন এক জায়গায় বলেছেন — আচার্য জেতারি তাঁকে নালন্দার আচার্য বোধিভদ্রের নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

বৌদ্ধরীতি অনুসারে পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত শ্রমণ-ভি( হওয়া যায় না। কুমার চন্দ্রগর্ভ অনুমতি সংগ্রহ করে জনাকয়েক অনুচরের সঙ্গে নালন্দা ফিরে গেলেন। প্রথমে নালন্দার রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলে রাজা জানতে চাইলেন — বাড়ির কাছে বিত্র(মশীলার মতো মহাবিহার থাকতে কুমার কেন এত দূরে নালন্দায় অধ্যয়ন করতে আগ্রহী।

কুমার বলেন — রাজন, নালন্দার মতো বিশাল ব্যাপ্তি ও প্রাচীন ঐতিহ্য আর কোথায়!

সেকথা শুনে রাজা সন্তুষ্ট হয়ে নালন্দা মহাবিহারে তাঁর জন্য সুন্দর আবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। কুড়ি বৎসর বয়সের আগে ভি( হওয়ার বিধান নেই। সেজন্যে আচার্য বোধিভদ্র তাঁকে শ্রমণরূপে দী(া দিলেন। দী(ান্তে চন্দ্রগর্ভের দেহে উঠল হলুদ বসন। তখনই কি তাঁর নাম রাখা হল 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান'?

সেসময় আচার্য বোধিভদ্রের গুরু ছিলেন মহাপণ্ডিত ও সিদ্ধযোগী অবধূতিপা। মতান্তরে অদ্বয়বজ্র বা মৈত্রীগুপ্ত বা মৈত্রীপা। রাজগৃহে কালশীলার দ(ি ণে বিজন নগরপ্রান্তে তিনি বাস করছিলেন। আচার্য বোধিভদ্র কিশোর দীপঙ্করকে সেখানে শি(ালাভের জন্য রেখে এলেন। দ্বাদশ বর্ষীয় দীপঙ্কর অষ্টাদশ বর্ষ অবধি গুরু অবধূতিপার সঙ্গে ছিলেন। এবং সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।

অবধূতিপার আরেক নাম অদ্বয়বজ্র। তিনি নালন্দা বিহারের আচার্য বোধিভদ্রের গুরু মৈত্রীপা নামেও পরিচিত। অবশ্য অবধূতিপা এবং অদ্বয়বজ্র একই ব্যক্তি( কিনা সন্দেহাতীত বলা যায় না। এক সময় আচার্য অবধূতিপা উত্তরবঙ্গে অবস্থিত দেবীকোট বিহারের সঙ্গে যুক্ত( ছিলেন। এদিকে পূর্বজীবনের কুমার চন্দ্রকেও আচার্য অবধূত বলা



হত — তবে ইনি অন্য কোন ব্যক্তি( হবেন। চন্দ্রগর্ভ তথা গুহ্যজ্ঞানবজ্রের গুরু অবধূতিপা পূর্ববঙ্গের বিত্র(মপুরী বিহারের সঙ্গেও নাকি যুক্ত( ছিলেন। তিব্বতী 'তাঙ্গুর' গ্রন্থ অনুসারে একাধিক অবধূতীপা নামধারী গুরুর সম্ভাবনা আছে।

গোস লোসাব আরো বলেন — অবধূতিপা বা মহাপৈণ্ডপাটিক ছয় প্রকার বরাহী-ধারণী (ধারিণী) বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও ধ্যানশি(া করেছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন বিরূপা যিনি আবার ইন্দ্রভূতির ভগিনী লক্ষ্মীঙ্করার কাছ থেকে শি(ালাভ করেন। ইনি পূর্ববাংলার (ত্রিয়কুলে জন্মেছিলেন। মহাসাংঘিক শাখায় দী(ালাভ করেন এবং গুহ্যসমাজ-মঞ্জুবজ্রের উপর ধ্যানাভ্যাস করেন। একবার স্বপ্নে দেখেন যে সূর্য-চন্দ্রকে ভ(ি ণ করে ফেলা হয়েছে। তারপর গুরু বিরূপার সা(াত লাভ করে তাঁর কাছে বজ্রবারাহী তন্ত্রে দী(া গ্রহণ করেন। আরো বিবিধ মন্ত্রতন্ত্রে শি(া ও ধ্যান অভ্যাস করতে থাকেন। একবার গঙ্গাতীরে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত এক ত্রিশূলের উপরে বিধর্মীরা লম্ফ দিয়ে প্রাণত্যাগ করছিল — তা দেখে তিনি সেই ত্রিশূলটি উৎপাটিত করে গঙ্গায় বিসর্জন দেন। পরে বিধর্মীরা অনেক অনুনয় বিনয় করলে নদীগর্ভ থেকে ত্রিশূলটি উদ্ধার করে তাদের ফিরিয়ে দেন। সেই সঙ্গে জানিয়ে দেন — এই প্রকার আত্মাহুতির পথে মুক্তি( নেই।

বৈরোচনকুলের দেবী বজ্রবারাহী তান্ত্রিকদের অত্যন্ত প্রিয় দেবী — ইনি হেরুক দেবতার অগ্রমহিষী। বর্ণ রক্তি(ম। দিগ্‌বসনা ও দ্বিভুজা। ত্রে(াধব্যঞ্জক প্রকাশভঙ্গী। শবের উপর অর্ধপর্যঙ্কাসনে নৃত্যরতা। কর্ত্রি কপাল খট্টাঙ্গ ইত্যাদি হস্তে ধারণ করে থাকেন। দেবীর মস্তক থেকে নির্গত হয়েছে বরাহী মুখ।

বজ্রযানে নানাপ্রকার মন্ত্র আছে। বীজমন্ত্র, হৃদমন্ত্র, মালামন্ত্র, শতা(র মন্ত্র ইত্যাদি। সর্বাধিক শক্তি(শালী মন্ত্র হল 'ধারিণী'। ভক্ত(দের বি(্বাস ধারিণী মন্ত্র থেকে তীব্র শক্তি( নির্গত হয় এবং মন্ত্র-শব্দের স্পন্দন ঘন থেকে ঘনতম হয়ে অদৃশ্য শক্তি(র জন্ম দেয়। তখন বোধিচিত্তের ভাবনার সঙ্গে সংযুক্ত( হলে সাধকের ইচ্ছানুসার কর্ম সাধিত হতে পারে। তন্ত্রের বি(্বাস, যথাযথ প্রযুক্ত( হতে পারলে, মন্ত্রের দ্বারা সর্ববিধ কার্যসাধন সম্ভব।

গোস লোসাব অনুসারে তান্ত্রিক চন্দ্রগর্ভ তিন বৎসর উড্ডিয়ানেও বাস করেছিলেন। সেখানে ডাকিনী সমভিব্যহারে তান্ত্রিক ভোজে অংশগ্রহণ করেন।

উড্ডিয়ান নামক স্থানের সঠিক অবস্থান নিয়ে প্রবল মতভেদ আছে। স্থানটি বাংলাদেশে না মগধের কাছে, নাকি বিহারে বা উড়িষ্যায়, তা নিয়ে তর্কবিতর্ক চলছে। ঐ স্থান উড্ডিয়ান বা উডিয়ান বা ও-রজিয়ান বা উ-রজিয়ান ইত্যাদি নামে তিব্বতী গ্রন্থে উল্লিখিত। একদা উড্ডিয়ান তন্ত্রসাধনার অন্যতম পীঠস্থান হিসেবে গণ্য হত। রাজা ইন্দ্রভূতি ও তাঁর ভগিনী লক্ষ্মীঙ্করার উদ্যোগে সেখানে গুহ্যসমাজ বিষয়ক তন্ত্রচর্চার ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল ও সমগ্র আর্যাবর্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিব্বতে সফল ধর্মপ্রচারক ও লামাতন্ত্রের উদ্ভাবক গুরু পদ্মসম্ভব ছিলেন উড্ডিয়ানের লোক।

সপ্তম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ উড্ডিয়ান প্রসঙ্গে লিখেছেন — উদকখণ্ড নগর থেকে ৬০০ লি পথ দূরে সু-পো-ফা-সু-তু বা সোয়াট নদীর উপত্যকায় অবস্থিত উ-চ্যাঙ-না বা উদয়ন রাজ্য। পরিধি ৫০০০ লি। রাজধানীর নাম সম্ভবত মেঙ-কিয়ে-লি বা মঙ্গলৌর। অধিবাসীরা ভীরু ও কপট। জ্ঞানলাভের জন্য বিদ্যালাভ করে না। ভোজবাজি তন্ত্রমন্ত্র পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পছন্দ করে। নীরবে বসে ধ্যান করে আর মর্মার্থ না বুঝে চাতুর্যের সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করে যায়। বিহারবাসীদের ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয় সর্বাস্তিবাদী ও মহাসাংঘিক এই পাঁচ প্রকার বিনয় শি(া দেওয়া হয়।

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তিব্বতী ধর্মপুস্তকের উল্লেখ করে বলেন — তন্ত্রের উৎপত্তি উড্ডিয়ানে। ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'সাধনমালা' অনুসারে উড্ডিয়ান, কামাখ্যা, সিরিহট্ট (শ্রীহট্ট) ও আসাম-স্থিত পূর্ণগিরি নামক চারটি স্থান তন্ত্রের মুখ্য পীঠস্থান ছিল। চারটি স্থানই বজ্রযোগিনী আরাধনার জন্য বিখ্যাত ছিল। সেখানে বজ্রযোগিনীর মন্দির ছিল। তার মধ্যে প্রধানতম পীঠ ছিল উড্ডিয়ানে।

গোস লোসাব অবশ্য বলে গিয়েছেন যে মগধের থেকে ২৩০ যোজন উত্তরে উড্ডিয়ানের অবস্থিতি।

চর্যাপদের গুরু লুইপাদ ও দীপঙ্কর একত্রে 'অভিসম্য-বিভঙ্গ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। রচনাকাল একাদশ শতকের প্রথম দিক। গুরু লুইপাদ অতীশের থেকে বয়সে জ্যেষ্ঠ। উড্ডিয়ানের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের লুইপা বা লুইপাদ চুরাশিজন সিদ্ধাচার্যের মধ্যে প্রথম সিদ্ধাচার্য। একদা উড্ডিয়ান রাজার লিপিকার ছিলেন। তাঙ্গুরে তাঁকে বাংগালী বলা হয়েছে। তিনি বাংলাভাষায় অনেক গীত রচনা করেছেন। সেজন্যে অনেকে উড্ডিয়ান বাংলাদেশে অবস্থিত বলেই মনে করেন।

নগোয়াং নিমার তথ্য থেকে লামা চিমপা অনেক কাহিনী শুনিয়েছেন। বলেছেন — চন্দ্রগর্ভ দশম বর্ষে বিদ্যাশি(া ব্যতীত চিকিৎসাবিদ্যা ও চারুকলায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। পঞ্চদশ বর্ষে সমগ্র 'ন্যায়বিন্দু' অধ্যয়ন করেন। অল্প বয়সে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার এতই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল যে তখন তিনি প্রধান প্রধান অবৌদ্ধ তর্কবিদদের পরাস্ত করতে পারতেন। একুশ বৎসর বয়সে চৌষট্টি কলাবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ ব্যাকারণ ও ন্যায়শাস্ত্রে সিদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ন্যায়বিন্দু' আচার্য ধর্মকীর্তির রচনা। ইনি নালন্দার সংঘস্থবির ধর্মপালের শিষ্য। আনুমানিক জীবনকাল ৬০০ খৃষ্টাব্দ।

মূলকথা, গুহ্যজ্ঞানবজ্র তখন বঙ্গদেশে অনেক তীর্থিকের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নেমে তাদের পরাস্ত করেন ও ধর্মান্তরিত করতে স( ম হন। এরকম বেশ কয়েকটি বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।



একবার জনৈক তীর্থিকের কন্যা তাঁর প্রণয়াসক্ত(া হয়ে পড়ে। পিতাকে বলে — পিতা, আপনি ঐ ভি( তর্কবিদকে পরাস্ত করে তীর্থিক ধর্মে নিয়ে আসছেন না কেন?

সেকথা শুনে পিতা গুহ্যজ্ঞানবজ্রকে দার্শনিক বিতর্কে আহ্বান জানালেন। বিতর্ক হল। পরে পিতাই পরাজয় স্বীকার করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

একবার দ( ণ ভারতীয় একজন 'পঞ্চ ছত্রধর' তীর্থিক পণ্ডিত এসে তাঁকে বললেন — শুনেছি আপনি বৌদ্ধসমাজের প্রধান পণ্ডিত( আমি অবৌদ্ধদের মধ্যে অন্যতম। তবে আমরা দুজনে তর্কযুদ্ধ লিপ্ত হই না কেন( যিনি পরাস্ত হবেন তিনি অপরের ধর্ম গ্রহণ করবেন, এই শর্তে।

তখন মগধের রাজাকে বিচারকের আসনে বসিয়ে তর্কযুদ্ধ শুরু হল। সামান্য বিতণ্ডার শেষে সেই তীর্থিক পণ্ডিত সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন। তারপর শর্তানুসারে তিনি সশিষ্য বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করলেন। সেকথা শুনে 'অষ্ট ছত্র'-ধারী আরেকজন তীর্থিক তর্কে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তিনিও সহজে পরাস্ত হলেন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন।

অনন্তর এগিয়ে এলেন ত্রয়োদশ ছত্রধারী আরেক পণ্ডিত। ইনি প্রমাণ-শাস্ত্রে খ্যাতনামা ব্যক্তি(। তর্কযুদ্ধের জন্য বিশাল আয়োজন করা হল। অনেক জ্ঞানীগুণী দুই পণ্ডিতের বাকযুদ্ধ প্রত্য( করতে সমবেত হয়েছেন। বিতর্ক যেমন অগ্রসর হচ্ছিল, আলোচ্য বিষয় ততই গভীরতর হচ্ছিল। ত্র(মশ তা অনুধাবন করার মতো দর্শক-বোদ্ধার সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছিল। একবার দেখা গেল মাত্র তেরোজন শ্রোতা মনোযোগ দিয়ে বিতর্ক শুনছেন। একটু পরে সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়াল পাঁচ এবং তারপর দুইয়ে। সেই সময় তীর্থিক পণ্ডিত তার শেষ প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দিলেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য গুহ্যজ্ঞানবজ্র দীপঙ্কর বিচলিত হয়ে পড়লেন। তখন তিনি মনে মনে তারাদেবীর ধ্যান করলেন। তাঁর কৃপায় অনতিবিলম্বে প্রশ্নের সদুত্তর দিতে সমর্থ হলেন। তীর্থিক পণ্ডিতের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করলেন। পরাস্ত ঐ তীর্থিক দীপঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

কাহিনীকার আরো বলেছেন — বাইশ বৎসর বয়সে কৃষ(পর্বতে তিনি ধ্যানাভ্যাস করেন ও হেবজ্র দেবতাকে প্রত্য( করেন। পরে গুরু রাহুলভদ্রের সঙ্গে সা( াত হয়। গুরু তাঁকে বজ্র-ডাকিনী-তন্ত্রে দী(া দান করেন। তদনন্তর চন্দ্রগর্ভের তান্ত্রিক নাম হয় জ্ঞান-গুহ্য-বজ্র। আবার হেবজ্রদর্শন হয়। তার অর্থ — ধ্যান সম্পূর্ণ হয়েছে। অনন্তর তাঁর সঙ্গে অনেক বজ্রযানী সন্ন্যাসীর দেখা হল। তাঁদের সান্নিধ্যে বজ্রযান সম্পর্কে আরো জ্ঞানার্জন করলেন। ঐ সময় স্বপ্নে দেখা দিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত বাগী(রকীর্তি। তাঁর নিকট এক ল( চার শত একান্নটি তন্ত্র শি( ালাভ করলেন। ত্র(মশ তাঁর আত্মোপলব্ধি হচ্ছিল যে একমাত্র তিনিই তন্ত্রশাস্ত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন। সেদিন রাত্রে একাধিক ডাকিনী স্বপ্নে এসে দেখা দিয়ে আরো তন্ত্রশাস্ত্র তাঁর সামনে প্রকাশ করে বললেন — তোমাদের দেশে অল্পকিছু তন্ত্র আছে, কিন্তু আমাদের কাছে আছে আরো অনেক।

ডাকিনীদের কথা শুনে জ্ঞান-গুহ্য-বজ্রের অহমিকা দূর হল।

একবার বিত্র(মপুরে অস্থি-করোটি-ভূষিতা অস্থিচর্মসার এক উলঙ্গিনির দর্শন পেয়েছিলেন। তিনি কখনো হাস্যময়ী তো কখনো ত্র(ন্দনরতা। জ্ঞান-গুহ্য-বজ্র মনে করলেন যে এই নারীর সন্ধানে দানের মতো অনেক রত্নাদি আছে। মনে মনে প্রণতি জানিয়ে তাঁর কাছে উপদেশ প্রার্থনা করলেন। ঐ নারী তাঁকে বললেন — যদি উপদেশ সত্যি চাও, তবে তোমাকে পুব বাংগলায় যেতে হবে।

একথা বলে অন্তর্হিতা হলেন। জ্ঞান-গুহ্য-বজ্র তাঁর অনুসরণ করতে করতে মহা(শ্মশানে এসে উপস্থিত হলেন। সহসা ঐ নারী ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন — কেমন করে জানলে যে আমার কাছে দেওয়ার মতো উপদেশ থাকতে পারে? আমাকে দেখে কি তাই মনে হয়?

জ্ঞান-গুহ্য-বজ্র উত্তরে বললেন — হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়।

খুশি হয়ে ঐ রমণী তখন তাঁকে 'অধিষ্ঠানবিধি' তন্ত্রে দী( া দিলেন। দী( ান্তে ঐ রমণীর দিকে তাকিয়ে জ্ঞান-গুহ্য-বজ্র বিস্মিত হয়ে গেলেন — তাঁর সামনে তখন সুন্দরী বজ্রডাকিনী বসে। তাঁরও মনে হল যে তিনি এক পুরুষ দেবতায় উন্নীত হয়েছেন যিনি নারীশক্তি(র সহিত মিলনে উন্মুখ। এমন অবস্থাকেই সাধনার এক স্তর 'অতুল্য-গুহ্য-সমাধি' বলে।

এরপর আরো কিছুকাল জ্ঞান-গুহ্য-বজ্র গুরু অবধূতিপার নিকট তন্ত্রশি( া ও উপদেশাদি লাভ করেন। একই সঙ্গে অনেক ব্রতাদি পালন করে চললেন। অনেক ডাকিনী-গীত শি( ালাভ করলেন। লব্ধ হল তারাদেবীর আশীর্বাদ।

একবার জ্ঞান-গুহ্য-বজ্র সমস্ত শক্তি( প্রয়োগ করে তন্ত্রচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। উদ্দেশ্য অবশিষ্ট জীবনের মধ্যে দ্রুত পূর্ণসিদ্ধি লাভ করতে হবে। গুরু রাহুলগুপ্ত স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন — এরকম কোরো না, সবাইকে ত্যাগ করে যেও না। ভি( সন্ন্যাস গ্রহণ করো। দৃঢ়তার সঙ্গে ধ্যানাদি অভ্যাস করে গেলে যথাসময়ে পূর্ণসিদ্ধি লাভ সম্ভব হবে। তাঁর যে এখন জগতের সকল মানুষের জন্য কিছু করার সময় এসেছে। প্রব্রজ্যা-বিধিও তাই বলে।

তারপর স্বপ্নে দেখা পেলেন হেবজ্র দেবের। তিনিও বললেন — অবধূতচর্যা নিয়ে আর অগ্রসর হয়ো না। দী( া গ্রহণ করো। সহস্রাধিক মানুষ তোমার মুখ চেয়ে আছে।

স্বপ্নে স্বয়ং শাক্যমুনিও এসে দর্শন দিলেন। তিনি সমগ্র সংঘ সমভিব্যাহারে এসেছিলেন। আশ্চর্যের কথা হল সেখানে তিনি দেখতে পেলেন, সেই ভি( সংঘের অন্তর্ভুক্ত( হয়ে বসে আছেন তিনি নিজেও। শাক্যমুনি তাঁকে ল( ্য করে বলছেন — এই মানুষটা কেন উপসম্পদা-দী( া গ্রহণ করছে না?

জ্ঞান-গুহ্য-বজ্র স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হলেন। স্থির করলেন, না, এবার ভি( -দী( া গ্রহণ করতেই হবে। তখন তাঁর বয়স উনত্রিশ বৎসর।



দীপঙ্করের কালে বঙ্গদেশে মন্ত্রতন্ত্র চর্চা প্রবল ছিল। বৌদ্ধ এবং অবৌদ্ধ উভয় ধর্মে।

মন্ত্রতন্ত্র চর্চা করে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন আচার্য তিলোপা নামের এক পণ্ডিত। পূর্বনাম প্রজ্ঞাভদ্র। তিলোপা বা তিলিপা বা তৈলপাদ নামে তিনি সমধিক পরিচিত। পাগ-সোম-জং-জাং গ্রন্থ মতে রম্ম দেশ তথা চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহারের সঙ্গে যুক্ত( ছিলেন। তিলোপা (৯৮৯-১০৬৯ খৃঃ ?) বাংলাদেশের চট্টগ্রামে চটিভাভো শহরের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর জন্মস্থান ছিল জাগোরা যার অবস্থান বাংলাদেশে কিনা নিশ্চিত বলা যায় না।

পিতার নাম প্রন্যাশ বা প্রনয়শ( মাতার নাম কাশি। বয়ঃপ্রাপ্ত কালে তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। ভি( ার জন্য স্থানে স্থানান্তরে ঘুরতে ঘুরতে কোন এক মন্দিরে

চিত্র-২ আচার্য তিলোপা

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের দেখে তিনিও সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তারপর কখন ত্রিপিটক শাস্ত্র পাঠ করে পণ্ডিত হয়ে ওঠেন বলা মুস্কিল। তাঁর নাম হয় প্রজ্ঞাভদ্র। ত্র(মে তান্ত্রিক মণ্ডল-শাস্ত্রে দী( ালাভ করেন। নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে তান্ত্রিক ধ্যানে গভীর মনোনিবেশ করেন। কিছুকাল সোমপুরী বিহারে ছিলেন। তাঁর শি( াগুরু ছিলেন মহান ব্রাহ্মণ সারাহা, আচার্য নাগার্জুন, মাতঙ্গী ইত্যাদি। বারো বছর ধরে তিনি শাস্ত্রচর্চা, তন্ত্রচর্চা ও ধ্যানে অতিবাহিত করে আশ্চর্য( মতার অধিকারী হন। লোকে বলে — তিনি স্বয়ং বুদ্ধ বজ্রধরের নিকট মহামুদ্রা ও বজ্রযানের শি( া লাভ করেছিলেন।

বজ্রধর বৌদ্ধ দেবমণ্ডলের আদিবুদ্ধ। ইনি সৃষ্টির আদি কারণ শূন্য বা বজ্র যা সর্বব্যাপী, সর্বকারণ ও সর্বশক্তি(র আধার। ইনি সর্বজ্ঞ। সৃষ্টির অণু-পরমাণুতে বর্তমান। সৃষ্টবস্তুসকল স্বভাবশুদ্ধ শূন্যরূপ নিঃস্বভাব ও বুদবুদের মতো। কেবল শূন্যই নিত্য। আদিবুদ্ধ সেই শূন্যেরই রূপকল্পনা।

লামা তারানাথের মতে — তিলোপা জনৈক তিল-পেষকের কন্যা ে( ত্রযোগিনীর সঙ্গে ধ্যানাভ্যাস করতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বৌদ্ধসন্ন্যাসী হয়ে তাঁর এই আচরণ সমর্থনযোগ্য ছিল না। তাঁকে বিহার থেকে বহিষ্কার করা হয়। সম্ভবত তিলোপা বা তিলিপা বা তৈলপাদ চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহারের সঙ্গে যুক্ত( ছিলেন। বিতাড়িত হয়েও তিনি তিল-পেষণ পেশা হিসেবে গ্রহণ করে জীবিকানির্বাহ করছিলেন। সেকারণেই তাঁর নাম হয় তিল্লিপা।

উড্ডিয়ানের ডাকিনীদের কাছেও তিনি নানা শি(ালাভ করেন। তিল পিষে পিষে তা থেকে মাখনের মতো করে তুলতে পারতেন। গুরুর শি(ানুসারে তিনি দেহমনও এমনভাবে পেষণ করতে পেরেছিলেন যে তা থেকে প্রজ্ঞারাশি উন্মুক্ত( হয়েছিল। এক সময় বাংলাদেশে কোন এক বেশ্যালয়ে ধারিমা নামের এক রূপোপজীবিনীর সঙ্গে বাস করছিলেন। গুরু মাতঙ্গীর নির্দেশ ছিল সেরকমই। সারা জীবন গভীরভাবে মহামুদ্রা ও তন্ত্র সাধনা করে তিনি পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেন। তারপর থেকে গানের মধ্য দিয়ে লোকশি(া দিতে লাগলেন। চুরাশীজন মহাসিদ্ধের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম একজন। নারোপা (নারপাদ?) ও ললিতবজ্র ছিলেন তাঁর দুই প্রধান শিষ্য।

আচার্য নারোপা বাংলার রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। আট বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করে কাশ্মীরে চলে যান। সেখানে আচার্য আকাশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দী(াও হয় তাঁর কাছে। পরে পূর্বদেশে এসে সিদ্ধাচার্য তিলোপাকে গুরুপদে বরণ করেন। গুরু তিলোপা একাদিত্র(মে বারো বার নারোপাকে কঠিন পরী(ার মধ্যে ফেলে যাচাই করেন। তারপর আরো বারো বার কঠিনতর পরী(ায় যাচাই করে তবে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য তাঁর কর্ম পরিশুদ্ধ করা এবং প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ, যাতে চিত্ত আরো স্বচ্ছ হয় ও ভাবনা নির্মল হয়। এতদ্বারা বজ্রধরের অনুভব সহজতর হবে।

উত্তর জীবনে নারোপা অনেক মঠে-বিহারে অধ্য( তা করেন। কাশ্মীরে তাঁর শিষ্য সংখ্যা ছিল সবথেকে বেশি। তিব্বতী শিষ্য মার্পাকে উত্তরাধিকার দান করে যান। চুরাশীজন সিদ্ধাচার্যের মধ্যে তিনিও একজন। আরেকটি সূত্র অনুসারে অবশ্য নারোপাকে তিব্বতদেশীয় বলা হয়েছে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন প্রজ্ঞারা(িত, কনকশ্রী ও মণকশ্রী (মাণিক্যশ্রী) এবং তিব্বতী মিলারেপার গুরু ভারবা-লোসাভা। নারোপার জীবনকাল কোন সূত্র মতে ১০১৬-১১০০ খৃষ্টাব্দ। তথ্যটি দীপঙ্করের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ নাড়পাদ বা নারোপা কিছুকাল দীপঙ্করের গুরু ছিলেন।

চিত্র-৩ আচার্য নারোপা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেছেন — আঠারো বছর বয়সে যখন দীপঙ্কর তন্ত্রশাস্ত্রে আরো



জ্ঞানলাভ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন, শি(ালাভ করতে গেলেন সেসময়ের অন্যতম তান্ত্রিক পণ্ডিত নালন্দা বিহারের উত্তর দ্বারের র( কের কাছে। ইনি আচার্য তিলোপা কিনা নিশ্চিত বলা যায় না। তিন বছর তাঁর কাছে দীপঙ্কর শি(ালাভ করেন।

তৎকালীন দু'জন খ্যাতনামা তান্ত্রিকদের কথা বলতে বসে মূল কাহিনী থেকে অনেকটাই সরে এসেছি। ফিরে যাই তান্ত্রিক চন্দ্রগর্ভের কথায়।

কোন বয়সে চন্দ্রগর্ভ তান্ত্রিক দী(া গ্রহণ করেছিলেন, কোন বয়সে ভি( দী(া গ্রহণ করেছিলেন, কোন গুরুর কাছে এবং কোথায়, তা নিয়ে নানা সূত্রে নানা কথা বলছে।

আচার্য জেতারি, রাহুলগুপ্ত, অবধূতিপা, নারোপা এই সকল খ্যাতনামা তান্ত্রিক গুরুদের কাছে গুপ্ত তন্ত্রাদি বিষয়ে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের কতদূর পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন? সঠিক জানা যায়নি। তবে একথা অবশ্যই বলা যায় যে উত্তরজীবনে তাঁর মন্ত্রতন্ত্র-জ্ঞান নানাভাবে কাজে লেগেছিল। বিশেষ করে তিব্বতে ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে। আবার একথাও সত্য, মন্ত্র-তন্ত্র চর্চায় তাঁর জ্ঞানতৃষ(া নিবারিত হয়নি। পরবর্তী জীবনের আরেক পর্যায় থেকে সেকথা স্পষ্ট হয়।

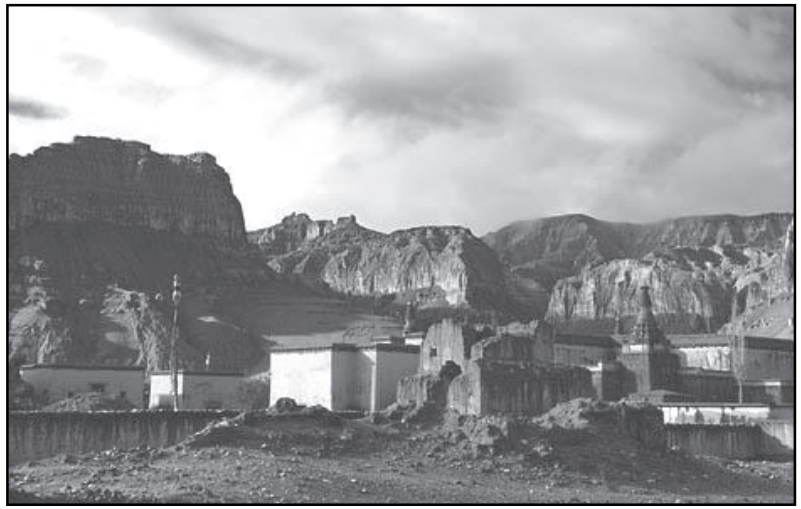

চিত্র-৪ থোলিং বিহার, পশ্চিম তিব্বত

## ৪। বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন

সেদিনও ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। সুপ্রসন্ন চিত্তে সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ সবিতর্ক, অবিতর্ক, নিষ্প্রতীক ও অদুঃখাসুখ ধ্যানে বোধিদ্রুমতলে বসে বিহার করতে লাগলেন। রজনীর প্রথম যামে দিব্যচ( উৎপন্ন হল। মধ্যম যামে পূর্বতন বিষয়সমূহ মনে পড়ল। শেষ যামে জগতের দুঃখের কারণ ভাবতে বসলেন। দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধের উপায় জানার পরে তিনি বুদ্ধ হলেন।

জীবন দুঃখময়। পুনর্জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখের কারণ। জীবনযাপনে মধ্যমপন্থা সর্বোচ্চ উপায়। প্রেম, মৈত্রী ও করুণা আশ্রয় করাই শ্রেয়। পুনর্জন্ম রোধ করতে পারলে অনাগত জীবনে দুঃখের অবসান হয়। নির্বাণে পুনর্জন্ম রুদ্ধ হয়। জীব নির্বাণলাভে যত্নবান হোক।

সেদিন চারটি আর্যসত্য উপলব্ধ হয়েছিল — এক, জীবনে জগতে দুঃখ আছে( দুই, দুঃখ-সমুদায় (হেতু বা উৎপত্তি) আছে( তিন, দুঃখের বিনাশ সম্ভব( চার, দুঃখনিরোধের উপায় আছে।

পাঁচটি উপাদান স্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) হল দুঃখ। পুনর্জন্মের হেতুভূত তৃষ(া হতে দুঃখ জন্মে। কাম, ভব ও বৈভব বিষয়ে তৃষ(ার জন্ম হয় এবং তৃষ(ার নিবৃত্তি হলে দুঃখ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানের অর্থ চেতনা বা চিত্ত।

দুঃখনিবৃত্তি হয় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণে। মার্গগুলি হল — সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প যা জ্ঞানের প্রকরণ( সম্যক বাক, সম্যক কর্ম্মান্ত ও সম্যক জীবিকা যা শীলের প্রকরণ( এবং সম্যক প্রযত্ন, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি যা সমাধির প্রকরণ।

প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ একটির উপর নির্ভর করে আরেকটির উৎপত্তি। এর অন্য নাম কার্যকারণনীতি। এই নীতির অন্তর্গত বারোটি অঙ্গ — অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান (চিত্ত), নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ(া, উপাদান, ভব, জাতি ও জরা-ব্যাধি-মরণ-শোকাদি। এই অঙ্গসকল চত্র(াকারে বিদ্যমান। এবং ইত্যাকার চত্রে(র নির্দিষ্ট আদি বা অন্ত নেই। আরম্ভ যে কোন স্থান থেকে হতে পারে। সার কথা অবিদ্যা বা অজ্ঞান দূর করতে পারলে দুঃখের অবসান হয়।

জাগতিক বস্তুসকল অনিত্য ও পরিবর্তনশীল। এতদ্বারা বৌদ্ধরা ( ণিকবাদী। আত্মা নামে কোন সৎ বস্তু বিদ্যমান নেই। জীব পাঁচ স্কন্ধের সমষ্টিমাত্র। এতদ্বারা বৌদ্ধধর্ম অনাত্মবাদী।

পুনর্জন্মের বি(াস আছে, তাই বৌদ্ধরা জন্মান্তরবাদী। ঈ(র বলে কিছু মানা যায় না। তাই বৌদ্ধরা অনী(রবাদী।



কর্মই সুহৃৎ, কর্মই উত্তরাধিকারী, কর্মই গতি, কর্মই বন্ধু, কর্মই আশ্রয়, কল্যাণ বা পাপ যে কর্মই করি না কেন তার উত্তরাধিকারী হবো। এতদ্বারা বৌদ্ধধর্ম কর্মবাদী।

সং( পে এই হল সৌগত বুদ্ধের সারকথা।

উন্মেষকালে তথাগত বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম ব্যাপারটা যেমন সহজবোধ্য ছিল, ত্র(মশ তা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে। যে মহান নৈতিক বোধ নিয়ে ধর্মের প্রাথমিক সূচনা, তা বহুল প্রচারের ফলে ও ব্যাপক বিস্তৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে নীতি-শৈথিল্যে গতিবেগ হারাতে থাকে। মূল্যবোধের অবনমন তথা বিবর্তন শুরু হয়। এবম্বিধ বিবর্তন প্রত্রি(য়া সমস্ত ধর্ম বা মতাদর্শগত প্রতিষ্ঠানের (ে ত্রেই অনিবার্য প্রাকৃতিক পদ্ধতি বলে মনে হয়।

তথাগতের মহাতিরোধানের অল্পকাল পরেই ধর্মসংঘে বিভেদের সূচনা হয়, সংঘের আচার-আচরণের প্রশ্নে। ধর্মভাবনার অন্দরমহলেই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দার্শনিক বিচারাদি শুরু হয়ে যায়। এর উপর অন্য ধর্মের আত্র(মণ আছে। ফলে ব্যাখ্যা, আরো ব্যাখ্যা, টীকা, আরো টীকায় দার্শনিক চিন্তার জটিল বিস্তার হতে লাগল। মাধ্যমিক-যোগাচার শাখা, হীনযান, মহাযান, তন্ত্রযান, বজ্রযান ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হতে লাগল। মনে হয় এ ব্যাপারে পণ্ডিতগণের অনুসরণে দু'চার কথা স্মরণ করা ভালো।

দেখা যায়, মহামানবেরা যে উচ্চভাবে সমুন্নত চিন্তাজগতে বিচরণ করেন, শিষ্য-অনুগতরা স্বাভাবিক কারণে ততদূর সমুচ্চ ভাব পোষণ করতে পারেন না। তারা অনেকবেশি নীতিনিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে জাগতিক মঙ্গলের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন এবং প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতির কূট তর্কে প্রমত্ত হন। যদি কোন যোগ্য উত্তরসূরী নির্বাচিত হয়, তাঁর উপর নির্ভর করে সংঘের বা প্রতিষ্ঠানের উচ্চ আদর্শের বহমানতা। তবুও সংঘের ল( ্যমুখীনতা বজায় রাখা সম্ভব হত কি না, তা নিয়ে ঘোর সন্দেহ আছে।

বুদ্ধ কোন উত্তরসূরী নির্বাচন করেন নি। সংঘে সর্বোচ্চ পদাধিকারী কেউ ছিল না। ফলে গণতান্ত্রিকতা যতই থাক, সংঘে বহুমতের প্রাদুর্ভাব স্বাভাবিক। তার উপর বুদ্ধ-লিখিত ধর্মগ্রন্থ নেই। থাকলেও অবস্থার পরিবর্তন হত না, তা নয়। সামান্য বিলম্বিত হত মাত্র। বুদ্ধ-প্রবর্তিত মৌখিক অনুশাসনই ছিল বুদ্ধপ্রবর্তিত ধর্মের প্রধান চালিকাশক্তি( । কালে কালে বুদ্ধবচনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হতে লাগল ও তা থেকে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। আশ্চর্যের কথা, বুদ্ধবচনও সৃষ্ট হতে লাগল।

বুদ্ধের মুখ্য শিষ্যগণ থেকেই শুরু হয়েছিল এই ভেদাভেদ। দেখা গেল মুখ্যশিষ্যগণের এক একজন ধর্মের এক একটি বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। ঐ এক একজনকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী গঠিত হল। বৌদ্ধ ভি( গণের মধ্যেও এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন সংঘে বিভাজনের অন্যতম কারণ হয়ে উঠল। বিনয়নিয়মবিশারদ থেকে বিনয়ধরগণ থেরবাদী শাখা, সুত্তপিটকবিশারদ থেকে সুত্তন্তিকগণ সৌত্রান্তিক শাখা, অভিধম্মবিশারদ

থেকে অভিধম্মীগণ সর্বাস্তিবাদী শাখা এবং বিভাষা তথা টীকাবিশারদগণ থেকে বৈভাষিক শাখা জন্ম নিয়েছিল।

ধর্ম, আদর্শ বা মতবাদ যত প্রচারিত হতে থাকে, ততই নানা স্তরের ও নানা সংস্কৃতির মানুষজন অন্তর্ভুক্ত( হয়ে আরো বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার সৃষ্টি করে চলে। লোকপ্রিয়তার কারণে নানা স্তরের লৌকিক আচার-বিচার ক্র(মশ মর্যাদা লাভ করতে থাকে। আমরা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তিনটি যুগের কথা বিবেচনা করতে পারি। প্রথমে নৈতিকতার যুগ, তারপর দার্শনিকতার যুগ এবং শেষভাগে মন্ত্রতন্ত্রের যুগ।

তথাগত বুদ্ধের মহানির্বাণলাভ হয় খৃষ্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে। মতান্তরে ৪৮৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে। তিনমাস পরে মগধের রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। মহান শি( ক-গুরু ইহলোকে নেই। তিনি গত হয়েছেন। তাঁর শি( াই পথপ্রদর্শক। বুদ্ধবাণী সংগ্রহ করা বুদ্ধবিহীন সংঘ ও বৌদ্ধসমাজের প্রধান কর্তব্য। সেখানে বিনয় ও ধর্ম্ম সংক্র(ান্ত বিষয়সকল আলোচিত হল ও সংস্থাপিত হল। প্রত্য( শিষ্যগণ দ্বারা বিনয়পিটক ও সুত্তপিটক আবৃত্ত হল। সংঘে বিভেদের বীজও প্রথম বৌদ্ধসংগীতিতে অঙ্কুরিত হল।

মহানির্বাণের একশত বৎসর পরে দ্বিতীয় সংগীতি আহূত হয় বৈশালীতে। ৩৮৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে। বুদ্ধের শি( াপদগুলির ব্যতিক্র(মের ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিচার করে যথার্থ বুদ্ধবচন র( া করার দায় ছিল। সেই সময় থেকে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম ভেদাভেদের সূচনা স্পষ্টতর হল। প্রধানত বিনয়ের দশবিধ আচরণ নিয়ে বিতর্কের শুরু হয়। মথুরার পণ্ডিত মহাদেবের ধর্মমত নিয়েও মতানৈক্য হয়। বৈশালীতেই বজ্জিপুত্তগণ পৃথক সংগীতির আয়োজন করে। তারপর থেকে র( ণশীল প্রাচীনগণ স্থবিরবাদী বা থেরবাদী ও বজ্জিভি( রা মহাসাংঘিক নামে পরিচিত হতে থাকে। এই দুটি ধারা থেকে ক্র(মে হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। হীনযানীদের ল( ্য ব্যক্তি(র মুক্তি( ও অর্হত্ব লাভ। মহাযানীদের ল( ্য সমষ্টির মুক্তি( ও বুদ্ধত্বলাভ।

স্থবিরবাদীদের মতে বুদ্ধ একজন অলৌকিক শক্তি(সম্পন্ন মানুষ বা দেবাতিদেব। বুদ্ধ নির্ধারিত আচার অনুষ্ঠান নিষ্ঠাভরে পালনীয়। দশ শীল পালন করতে হবে। চল্লিশ কর্মস্থান আছে। সমাধি হল চিত্তের একাগ্রতার স্তর। প্রজ্ঞা অবিদ্যা দূর করে( চতুরার্যসত্য ও প্রতীত্যসমুৎপাদের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করতে হবে। অষ্টাঙ্গিক মার্গ, অনাত্মবাদ ও কর্মবাদের উপর তারা বিশেষ জোর দেন। ভি( ুর চরম আদর্শ অর্হত্বলাভ। স্থবিরবাদীদের ত্রিপিটক রচিত হল পালি ভাষায়। মহাসাংঘিকদের মতে আবার বুদ্ধ এক নয়, বহু। এবং তাঁরা লোকোত্তর ও নিরন্তর সমাধিমগ্ন। তারা বুদ্ধের উপর দেবত্ব আরোপ করে বিভিন্ন প্রতীকের পূজা করতে শুরু করেন। পরে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ ও মূর্তিপূজার প্রচলন হয়।

তৃতীয় সংগীতি বসে পরিনির্বাণের ২৩৬-তম বর্ষে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে। অর্থাৎ ২৫৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে। ইতিমধ্যে বৌদ্ধধর্মে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। মহাসাংঘিকরা



আটটি ও স্থবিরবাদীরা সম্ভবত বারোটি শাখায় বিভক্ত( হয়েছে। স্থবিরবাদীরা বিভক্ত( হল স্থবিরবাদী, মহীশাসক, বাৎসীপুত্রীয়, সাম্মিতীয়, ষণ্ণাগারিক, ভদ্রযানীয়, ধর্মোত্তরীয়, সর্বাস্তিবাদ, ধর্মগুপ্তক, কাশ্যপীয়, হৈমবত এবং সংক্র(ান্তিক এই দ্বাদশ শাখায়।

মহাসাংঘিকেরা বিভক্ত( হল মহাসাংঘিক, একব্যবহারিক, চৈত্যক, কৌকুট্টিক, বহুশ্রুতীয়, প্রজ্ঞপ্তিবাদী, পূর্বশৈল ও অপরশৈল মতবাদে। আরো কিছু সম্প্রদায়ের কথা শোনা যায় — অন্ধ্রক, রাজগিরিক, সিদ্ধার্থক, বৈপুল্যবাদ, উত্তরাপথক ও হেতুবাদী।

তৃতীয় সংগীতি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করার ল( ্যে আহূত হয়েছিল, তবে তা অর্জিত হয়নি। এই সংগীতির উল্লেখ স্থবিরবাদী গ্রন্থে আছে। উত্তরদেশীয় মহাযান গ্রন্থে নেই। মোগ্গলিপুত্ত তিস্স সংগীতির আহ্বায়ক ছিলেন। সর্বাস্তিবাদী সংগঠনের প্রধান উপগুপ্ত যুক্ত( ছিলেন কিনা নিশ্চিত নয়। পালি ত্রিপিটকের তৃতীয় পিটক অভিধম্মের কথা এই সম্মেলনের বিবরণী থেকে জানা যায়। সম্রাট অশোকের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম দেশেবিদেশে প্রচারিত হয়। লংকায় পাঠানো হয় মৌর্য রাজপরিবারের মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে।

চতুর্থ বৌদ্ধসংগীতি পরিনির্বাণের ৩৯৯ বৎসর পরে কণিষ্কের আমলে অনুষ্ঠিত হয়। ৮৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে। প্রথম পিটক যুগের সমাপ্তি ও বিভাষাশাস্ত্র যুগের সূচনা হয় এসময়। এর উল্লেখ উত্তরদেশীয় গ্রন্থে আছে, সিংহলী গ্রন্থে নেই। পার্শ্ব, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ এঁরা এই সংগীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কণিষ্কের সময় সর্বাস্তিবাদীরা বৈভাষিক নামে পরিচিত হলেন। চতুর্থ সংগীতিতে এঁদের প্রাধান্য ছিল।

স্থবিরবাদের এক শাখা সর্বাস্তিবাদ। 'সর্বং অস্তি' এই অর্থে এঁরা অতীত, অনাগত, প্রত্যুৎপন্ন (বর্তমান), আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন। অতীত, অনাগত ও বর্তমান একই পরম্পরায় বিধৃত — এভাবে ত্রিকালাস্তিত্ববাদীরা সর্বাস্তিবাদী। সর্বাস্তিবাদীদের থেকে দুই শাখা বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল।

বৈভাষিক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে। কাশ্মীরের অধিবেশনে রচিত বিভাষাশাস্ত্র থেকে উৎপন্ন, তাই বৈভাষিক। এঁরা অস্তিবাদী। মন ও অতিরিক্ত( সবই সত্য মনে করে। জাগতিক বস্তুর জ্ঞান প্রত্য( সিদ্ধ। সূত্র গুরুত্বপূর্ণ নয়। বুদ্ধ একজন সাধারণ মানুষ যিনি সাধনার দ্বারা নির্বাণের স্তরে উন্নীত হয়েছেন। প্রজ্ঞাশীলতা ও বিচ( ণতার দ্বারা অতিমানবিক স্তরে পৌঁছোন। নির্বাণ আনন্দময় স্তর। বাহাত্তরটি হেতুজাত সাস্রব বা সংস্কৃত ও তিনটি অহেতুক অনাস্রব বা অসংস্কৃত ধর্ম আছে। জীবের উৎপত্তি স্কন্ধ ও মহাভূতের সমন্বয়ে। আত্মা বা পুদ্গল নেই।

বৈভাষিকদের কিছু পরে আচার্য কুমারলাত (কুমারলব্ধ) ও তাঁর শিষ্য, এবং দ্বিতীয় শতকের হরিবর্মন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়। এঁরা অভিধর্ম বর্জন করে

সূত্রকেই প্রামাণ্য বলেছেন যা থেকে অভিধর্ম উৎপন্ন হয়েছে। এঁদের মতে বুদ্ধ অতিমানব, দশ বল, চার বৈদ্যবিশারদ এবং তিন স্মৃত্যুপস্থানের অধিকারী। মন ও অতিরিক্ত( সকল বস্তুই সত্য। বাহ্যবস্তু অনুমানসিদ্ধ। পুদ্গালশূন্যতা ও ধর্মশূন্যতা মূল সূত্র। সাংবৃতি বা জাগতিক ও পরমার্থ বা অতিপ্রাকৃত উভয় সত্যই স্বীকৃত। অনিত্যতা ধর্মের ল( ণ যা শূন্যস্বভাব ও অলীকরূপী। নির্বাণ অবস্তুক।

বৌদ্ধদর্শনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করার উদ্দেশে মাধ্যমিক ও যোগাচার সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়েছিল। উত্তরকালে তারা অধিক প্রভাবশালী হতে স( ম হয়।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক দার্শনিক নাগার্জুন মাধ্যমিক মতবাদের প্রবর্তন করেন। ত্র(মে তৃতীয় শতকে আর্যদেব, পঞ্চম শতকে বুদ্ধপালিত ও ভাববিবেক, ষষ্ঠ শতকে চন্দ্রকীর্তি ও সপ্তম শতকে শান্তিদেব মাধ্যমিক মতবাদ পুষ্ট করেন। নাগার্জুন শূন্যবাদের প্রবক্ত(া। বুদ্ধের ধম্মচক্কপ্পবত্তন সূত্তে বর্ণিত মজ্ঝিমপটিপদা দ্বারা শূন্যবাদের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। বস্তুকে অস্তি-নাস্তির পরিপ্রে( তে চার ভাবে বিচার করা যায়। অস্তি বা হ্যাঁ, নাস্তি বা না, অস্তি-নাস্তি কোনটাই নয়, এবং অস্তি-নাস্তি উভয়ই। অস্তি বলতে শা(্বত এবং নাস্তি বললে অশা(্বত বোঝায়। আসলে এর কোন একটিকে স্বীকার করা যায় না কেননা তারা আপে( ক সম্বন্ধ মাত্র। সত্য দু'প্রকার – সংবৃত বা ব্যবহারিক এবং পরমার্থ বা লোকোত্তর। প্রথমটি অজ্ঞান বা মোহ। দ্বিতীয়টি পরমার্থ জ্ঞান তথা শূন্যতার সমতুল। সংবৃতি হল উপায় এবং পরিমার্থ হলপরিণাম। প্রতীত্যসমুৎপাদ আসলে একটির উপর নির্ভর করে অন্য একটির উৎপাদ। প্রতীত্যসমুৎপাদ ভাবনা জাগতিক কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে যা পরমার্থ দৃষ্টিতে নির্বাণ বা শূন্যতা বলে গণ্য হয়।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে আচার্য মৈত্রেয় আবার যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে চতুর্থ শতকে অসঙ্গ ও বসুবন্ধু, পঞ্চম শতকে স্থিরমতি ও দিঙনাগ, সপ্তম শতকে ধর্মপাল ও ধর্মকীর্তি, অষ্টম শতকে শান্তর( ত ও কমলশীল যোগাচার দর্শনে বিশিষ্ট অবদান রাখেন। এঁরা বোধিলাভের জন্য যোগমার্গের উপর নির্ভরশীল। বোধিসত্ত্বকে বোধিজ্ঞান লাভের জন্য দশভূমি বা সাধনার দশটি স্তর অতিত্র(ম করতে হয়। জগতে কোনকিছুরই যথার্থ অস্তিত্ব নেই। বিজ্ঞান, চিত্ত বা মন একমাত্র সত্য। অন্য সব মিথ্যা। বিজ্ঞান দ্বিবিধ – প্রকৃতিবিজ্ঞান (প্রত্যেক জ্ঞানত্রি(য়াই প্রকৃতি বিজ্ঞান) এবং আলয়বিজ্ঞান বা জ্ঞানসমষ্টি যা সকল ধর্মের বীজস্বরূপ। আলয় বিজ্ঞানই হল তথাগতগর্ভ – সর্বদা স্রোতের ন্যায় পরিবর্তিত হয়। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি হলে স্রোতধারা স্থিরভাব লাভ করে। নৈরাত্ম্য দুই প্রকার –পুদ্গল নৈরাত্ম্য যেখানে আত্মার অনস্তিত্ব স্বীকৃত এবং ধর্মনৈরাত্ম্য যেখানে জাগতিক বস্তুরসমূহের অনস্তিত্ব প্রকট। প্রথমটির জ্ঞান ক্লেশাবরণের নিরসনে লভ্য। দ্বিতীয়টির জ্ঞান জ্ঞেয়াবরণের নিরাকরণে। অনস্তিত্বের জ্ঞানলাভে উভয়ের প্রয়োজন। সত্য তিন প্রকার – পরিকল্পিত, পরতন্ত্র (পরের উপর নির্ভরশীল ও কার্যকারণসম্পর্ক



যুক্ত( ) ও পরিনিষ্পন্ন (বা সর্বোত্তম সত্য)। প্রথমোক্ত( দুটি সংবৃতি সত্য সংশ্লিষ্ট এবং তৃতীয়টি পরমার্থ সংশ্লিষ্ট। বি(্ব স্বপ্নের ন্যায় অলীক। একমাত্র সত্য তথতা বা ধর্মধাতু (মাধ্যমিক মতে যা শূন্যতা)।

মাধ্যমিক ও যোগাচার মতবাদ যুক্ত( হয়ে মহাযান ধর্মমতের সৃষ্টি হয়েছে। এঁরা স্থবিরবাদীদের হীনযান সংজ্ঞায় ভূষিত করেন। তদবধি স্থবিরবাদীরা হীনযানী ও অন্যান্যরা মহাযানী নামে পরিচিত হলেন। প্রকৃতপ( আচার্য নাগার্জুনই মাধ্যমিক মতের প্রবর্তন করে মহাযান ধর্মমতের সূচনা করেন। মহাযানের আদর্শ বুদ্ধত্বলাভ। তারা নিজেদের নির্বাণ প্রার্থনা করেন না, জগতের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করেন। আপামর জগতবাসীর মো( লাভ তাদের উদ্দেশ্য। হীনযানীদের আদর্শ নিজেদের জন্য অর্হত্ব লাভ।

মহাযানীদের আরেক বৈশিষ্ট্য হল বোধিসত্ত্ববাদ। তারা মনে করেন সকলেই বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারে। তার জন্য প্রথমে সাধককে বোধিসত্ত্ব হতে হবে। পরোপকারে আত্মোৎসর্গ করতে হবে। তবেই সাধক বোধিসত্ত্ব আখ্যা লাভ করবেন। তাদের ভাবনার মূল সুর – জগতের সব দুঃখ যেন তারাই ভোগ করেন এবং তাদের কুশল কর্মের জন্য জগতে যেন সুখ নেমে আসে। বোধিসত্ত্বকে বুদ্ধত্বলাভের জন্য দশটি চর্যায় পূর্ণতা লাভ করতে হবে। এই পূর্ণতালাভই পারমিতা। মহাযানে দশ পারমিতার কথা বলা হয়েছে। বোধিসত্ত্ব পারমিতায় দ( হয়ে উঠলে মনোবৃত্তি উচ্চ হয় এবং চিত্ত করুণায় ভরে ওঠে। মনোবৃত্তি অনুসারে দশটি ভূমি অতিত্র(ম করে বুদ্ধত্ব লাভ করতে হয়। হীনযানে চারটি শুদ্ধ অবস্থা আছে – স্রোতাপত্তি, সকৃদগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব।

মহাযানে বুদ্ধের তিনটি কায় কল্পনা করা হয়েছে – নির্মাণকায়, সম্ভোগকায় ও ধর্মকায়। নির্মাণকায়ে বুদ্ধ মানুষরূপী। তখন তিনি শ্রাবক, প্রত্যেকবুদ্ধ ও জনসাধারণকে উপদেশ দেন। সম্ভোগকায়ে তাঁর জ্যোতির্ময় রূপ প্রকাশিত। তখন তিনি বোধিসত্ত্বদের উপদেশ দেন। ধর্মকায় হল বুদ্ধের শা(্বত রূপ। একে তথতা বলে। কেবলমাত্র ধর্মকায়ে বুদ্ধের অদ্বিতীয় রূপ ধৃত আছে। বোধিসত্ত্বগণ ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ দূর করে বিশুদ্ধ ধর্মকায় অর্জন করেন। মহাযানীরা পুদ্গাল-নৈরাত্ম্য ও ধর্ম-নৈরাত্ম্যে বি(্বাস করেন। হীনযানীরা কেবল পুদ্গাল-নৈরাত্ম্যে বি(্বাসী। মহাযানে আত্মা ও জগত অস্বীকৃত, কেননা সবই শূন্যগর্ভ। হীনযানে আত্মা অস্বীকৃত।

মহাযানে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপে( া এই চার প্রকার ব্রহ্মবিহারের কথা বলা হয়। মহাযান দর্শনমূলক কেননা দর্শনের উপর প্রাধান্য আছে। হীনযান নীতিমূলক কেননা সেখানে নৈতিকতার উপর জোর বেশি। মহাযানে শাক্যসিংহ গৌতম বুদ্ধ আবার তেমন করে নেই, যেমনটা হীনযানে আছে।

সুকোমল চৌধুরী বলেছেন – বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব বিবেচনা করলে হীনযান ও মহাযানের মধ্যে 'বৈসাদৃশ্য অপে( া সাদৃশ্যই বেশি'। বরঞ্চ তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে তাকে

'বিপথে চালিত' করেছে। 'যোগসাধনার গূঢ়ার্থ সম্যক উপলব্ধি' করতে না পেরে 'ধর্মের নামে ইন্দ্রিয়সুখানুভূতিকেই পরমার্থ' জ্ঞান করেছে।

খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতকে তন্ত্রমন্ত্র-মুদ্রা-ন্যাস-মণ্ডল ইত্যাদি তান্ত্রিক ত্রি(য়াকর্ম মহাযান ধর্মের অন্তর্ভুক্ত( হল। নালন্দা, বিত্র(মশীলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতি বি(েবিদ্যালয়ের আচার্যদের হাতে এই অভিনব চিন্তাধারা ও ত্রি(য়াকলাপ পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। মহাযান ধর্ম এতদ্বারা তান্ত্রিক মহাযান মতবাদে রূপান্তরিত হল। সূত্রপাত অসংগের সমকালে চতুর্থ-পঞ্চম শতকে। আসলে ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল অবধি মন্ত্রতন্ত্র সযত্নে লালিত। ব্যাপক জনসমাজে পৌঁছতে গেলে তা সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা কারো প(ে ই সম্ভব ছিল না। বুদ্ধ প্রবর্তিত মুদ্রা, মন্ত্র, মণ্ডল ইত্যাদি তারই অঙ্গ ছিল — এমনটা হয়তো ভাবা যায়। পরবর্তীকালে এসবের বিস্তৃতি ঘটেছে। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণ এবং তাঁদের পত্নীরা প্রধান দেবদেবী হয়ে উঠলেন। পিশাচী, মাতঙ্গী, ডাকিনী, যোগিনী ইত্যাদিরাও ত্র(মে তন্ত্রযানে স্থান পেল। এসবের অন্যতম লালনভূমি পূর্বভারত ও বঙ্গদেশ।

অতিপ্রাকৃত ( মতালাভই তন্ত্রযান-সাধনার মূল উদ্দেশ্য। মন্ত্রকে আশ্রয় করে সাধনার এই প্রকার পর্যায়কে মন্ত্রযান বলা হতে লাগল। মন্ত্র, রহস্যময় শক্তি( পূর্ণ শব্দ ও অ( র মুক্তি( অর্জনের প্রধান উপায়। বুদ্ধত্বলাভ কঠিন। মন্ত্র জপ পূজা ও বিবিধ ত্রি(য়াকলাপের মাধ্যমে বুদ্ধত্বলাভ সহজ এবং সেটাই প্রকৃষ্ট পথ হিসেবে গণ্য হতে লাগল। মন্ত্র মনকে সুর( ত করে। ধ্যানে চিত্তসংযোগের জন্য মন্ত্র এক কার্যকরী পন্থা। মন্ত্রসকল ধারণী নামে অন্তর্ভুক্ত( হয়েছিল। চার প্রকার ধারণী আছে — ধর্মধারণী (স্মৃতি-প্রজ্ঞা-বলের মন্ত্র), অর্থধারণী (ধর্মের অর্থ-প্রাপ্তির মন্ত্র), মন্ত্রধারণী (পূর্ণতালাভের মন্ত্র) ও বোধিসত্ত্বধারণী (বোধিসত্ত্বের প্রাপ্ত নিবৃত্তি লাভের মন্ত্র)। কেউ কেউ বলেন — মন্ত্রের অর্থ নিরর্থক হলেও অর্থশূন্য মন্ত্রের উচ্চারণে, জগত অর্থহীন ও শূন্য, এমন বোধের উদ্ভব হয়( একই সঙ্গে নএ(র্থক অর্থ দ্বারা পারলৌকিক সত্য সূচিত হয় যা বস্তুর সম্যকরূপ অনুধাবনে সহায়ক হয়। মন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত( মুদ্রা ও বোধিমণ্ডল বা বোধিবৃ( র বৃত্ত রচনা। ত্র(মে যুক্ত( হয় যৌনাচার যুক্ত( যোগাচার যা মো( লাভের একমাত্র পথ হয়ে ওঠে। এপথে গুরু ব্যতীত একবিন্দু অগ্রসর হওয়া যায় না যত( ণ না সাধক স্বয়ং গুরু হয়ে ওঠেন।

ত্র(মে বজ্র নামের এক ধারণার জন্ম হল। মোহিনী শক্তি( অর্জন করে মুক্তি( সম্ভব এবং ঐ শক্তি(ই বজ্র। শূন্যতা যা দৃঢ়, বলিষ্ঠ, অবিভাজ্য, অভেদ্য ও ধ্বংসরহিত, তাই বজ্র। শূন্যতার অর্থ মহাসুখশূন্যতা( নির্বাণ মহাসুখময়। বোধিচিত্তই বজ্র। গুরু নির্দেশে কঠোর সাধনার ফলে বোধিচিত্ত স্থির-স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং বজ্রের মতো অভেদ্য অচ্ছেদ্য ও অদাহ্য হয়। সাধক তখন বোধিজ্ঞান লাভ করে। বজ্র আশ্রয় করে যে সাধনপদ্ধতির প্রবর্তন হয়, তাকে বজ্রযান বলা হয়। মৈথুনযোগে চিত্তের চরমানন্দলাভ হলে বোধিচিত্ত উৎপন্ন হয়। মন্ত্রযানের এক শাখা হল বজ্রযান। ছয়প্রকার তান্ত্রিক অভিচার আছে —



মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচাটন ও বশীকরণ। আর আছে যৌনাচারযুক্ত( যোগবিধি। সর্বোচ্চ দেবতা বজ্রসত্ত্ব। বজ্রযান মতে মন্ত্র যদি সঠিক উচ্চারণ করা যায় এবং যন্ত্র ( মোহিনী প্রতীক) সঠিকভাবে অঙ্কন করা যায় তাহলে পূজারী মোহিনীশক্তি( লাভ করে। 'ওম মণিপদ্মে হুম' মন্ত্রে বুদ্ধের সাথে প্রজ্ঞাপারমিতার, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতে(রের সঙ্গে তারার যৌন মিলনের ইঙ্গিত আছে। পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের ও তাঁদের শক্তি( বা সঙ্গিনীর ধারণা, তিনদলে যোলোজন বোধিসত্ত্বের ধারণা এই মতবাদে রচিত হয়েছে। ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'সাধনমালা' গ্রন্থে তা বিশদে বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধরা হলেন বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং অ( ভ্য। শক্তি(রা হলেন যথাত্র(মে লোচনা, বজ্রধাত্বী(রী, পাণ্ডরা, তারা এবং মামকী। আদিবুদ্ধ হলেন বজ্রধর যার শক্তি( প্রজ্ঞাপারমিতা। মানুষী বুদ্ধ অনেক — তার মধ্যে শাক্যসিংহ গৌতম বুদ্ধ হলেন শেষ মানুষীবুদ্ধ।

বজ্রযান সাধনার উচ্চতম স্তর। সহজ আরেকটি পদ্ধতি এসে গেল — সহজযান। প্রকৃতি স্বরূপ শূন্যতা ও পুরুষ স্বরূপ করুণার যোগমার্গীয় মিলনে যখন অনির্বচনীয় সুখ লাভ করা যায়. তখন বোধিচিত্তের আবির্ভাব হয়। মোহ দূর হয় ও শূন্যতার জ্ঞানলাভ হয়। সাধক মুক্তি(লাভ করেন। দোহাকোষ ও চর্যাগীতির মধ্যে এই প্রকার সহজযানী সাধনার কথা জানা যায়।

সিদ্ধাইগণের মধ্যে শবর, সরহপাদ, লুইপাদ, নাগার্জুন, তিল্লোপাদ, ভুসুকু, কুক্কুরি ইত্যাদি আছেন। সরহপাদ ও লুইপাদ উভয়ে ছিলেন শবরপাদের শিষ্য। আরেক সূত্র অনুসারে সরহপাদ ছিলেন পালরাজ ধর্মপালের সমসাময়িক হরিভদ্রের শিষ্য এবং হরিভদ্র ছিলেন শান্তর( তের শিষ্য। সরহ বা সরহপাদ পূর্বভারতের রাঞ্জী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নালন্দার আচার্য ছিলেন। তান্ত্রিক নাগার্জুন সরহর শিষ্য। লুইপাদকে প্রথম সিদ্ধাচার্য বলা হয়। ইনিই সম্ভবত নাথগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ যিনি নাথ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলা ভাষায় চর্যাপদ নামক কাব্য রচনা এই সিদ্ধাইগণের কীর্তি। লুইপাদ অতীশ দীপঙ্করের অগ্রজ। তাঙ্গুর অনুসারে চর্যাপদের গুরু লুইপাদ ও দীপঙ্কর একত্রে 'অভিসময়-বিভঙ্গ-নাম' নামে শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। রচনা কাল একাদশ শতকের প্রথম দিকে। অনুবাদ করেন আচার্য দীপঙ্কর ও লোসাব জয়শীল। তবে ইনিই চর্যাপদের গুরু না অন্য কেউ, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। চুরাশীজন সিদ্ধাচার্যের কথা শোনা যায়। দোহাকোষ ও চর্যাগীতিতে সহজযানের সাধনপদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। তিব্বতী গ্রন্থে বেশ কিছু দোহাও সংর( ত।

সহজযান মতাদর্শে মন্ত্রতন্ত্র বা জপতপের মূল্য নেই। দেহবাদ বা কায়াসাধনাই মুখ্য। মহাসুখ উপলব্ধি করলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসকল, সংসার, আত্মপরভেদ সবই লোপ পায়। শরীরের মধ্যে আছে গুপ্তলীলা। পাপপুণ্য নেই। সহজে মন স্থির করে যে সাধক সাম্যভাবনা করতে পারেন তিনিই সিদ্ধ। মহাসুখের স্থান মস্তিষ্কের উচ্চতম অংশে। বত্রিশনাড়ীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত শক্তি( মহাসুখকর স্থানে পৌঁছয়।

বজ্রযান থেকে আরেক সাধনমার্গ উদ্ভূত হল কালচক্র(যান নামে। উদ্ভব শম্ভল নামক স্থানে। কালচক্র( ধ্বংসের চক্র(। কালচক্র(যান ধ্বংস হতে র(া করে। কালচক্র( শূন্যতা ও করুণার প্রতীক। উৎপত্তি নেই, (য় নেই। জ্ঞান ও জ্ঞেয়, ত্রিকাল ও ত্রিকায়, সকলের উদ্ভব কালচক্রে(। কালচক্র( সর্বজ্ঞ, মহাশূন্য ও আদিবুদ্ধ। এই আদিবুদ্ধ হতে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ সৃষ্ট। ইনি মানবরূপে বজ্রধর। বজ্রধর শূন্যের প্রতীক এবং তাঁর শক্তি( প্রজ্ঞাপারমিতা করুণার প্রতীক। উভয়ে একত্রে একাত্ম বা অদ্বৈত। ত্রিকাল ও ত্রিকায় (সম্ভোগকায়, নির্মাণকায়, ও ধর্মকায়) কালচক্রে( নিহিত। নিয়ত পরিবর্তনশীল কালচক্র(কে প্রতিহত করে সাধককে তার উর্দ্ধে উঠতে হবে। যোগসাধনার দ্বারা শরীরের পঞ্চবায়ু আয়ত্বে এনে প্রাণত্রি(য়া রুদ্ধ করে কাল জয় করা সম্ভব। একাজে তিথি ন( ত্র রাশি ইত্যাদির বিশেষ ভূমিকা আছে। লামা মতবাদের উদ্ভব কালচক্র(যান হতে। সুচন্দ্র-অভয়াকরগুপ্ত এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। অভয়াকরগুপ্ত রচিত 'নিষ্পন্নযোগাবলী' সম্ভবত ১১৩০ সালে রচিত। পাল রাজাদের সময় বাংলায় কালচক্র(যান প্রচলিত ছিল। এক সময় কা(্মীরের মধ্য দিয়ে তা তিব্বতে প্রচারিত হয়।

মণিকুন্তলা হালদার বলেছেন – গৌতম বুদ্ধ যে 'মৈত্রীমূলক সদ্ধর্ম' প্রবর্তন করেছিলেন, কালে কালে তাঁর মূল তত্ত্বগুলি লোপ পায় এবং 'এক অপমিশ্র বা নূতন ধর্মে' পরিণত হয়। গৌতম বুদ্ধের স্থানে ধ্যানীবুদ্ধ, আদিবুদ্ধ, বজ্রধর, বোধিসত্ত্ব, ভবিষ্যবুদ্ধ এমন কত প্রকার বুদ্ধের অবতারণা যে হল তার ইয়ত্তা নেই!

এতসব ঘটনার ঘনঘটায় মহামানব গৌতম বুদ্ধের করুণাঘন মূর্তিটি কিন্তু ম্লান হয়ে গেল।

চিত্র-৫ চোর্তেন, থোলিং বিহার



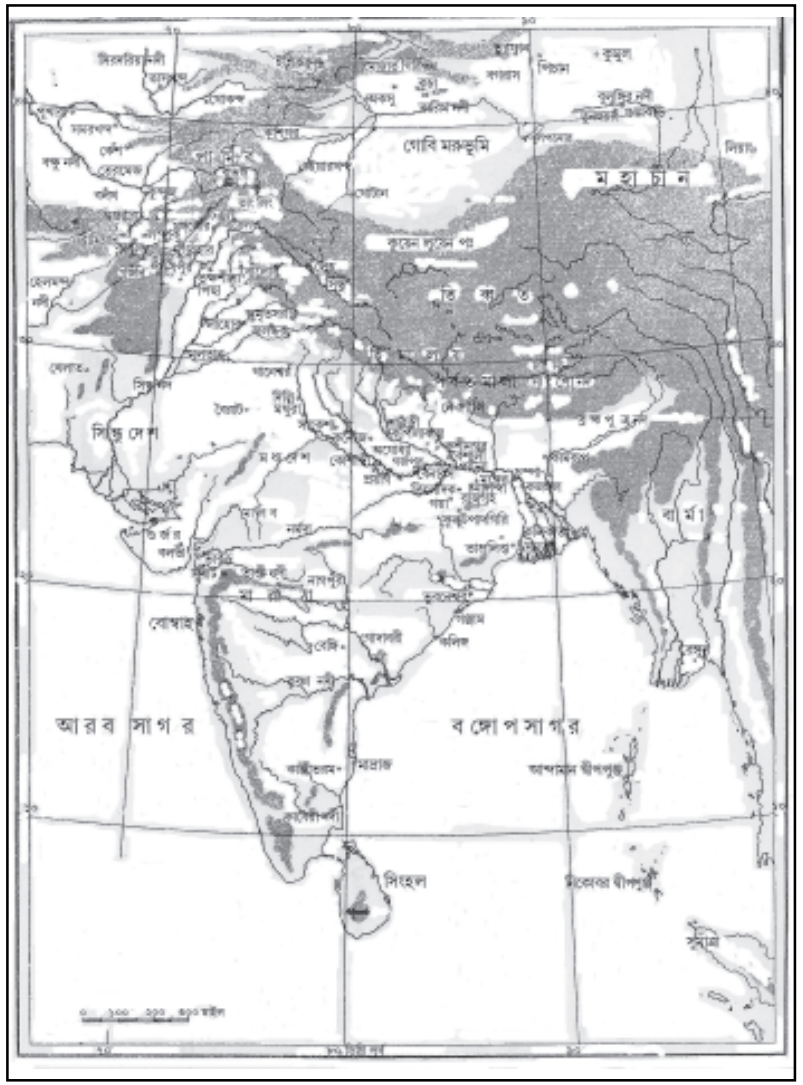


মানচিত্র-২ প্রাচীন ভারত

## ৫। দী(ানাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান
## (১০১১ খৃঃ)

ভগবান বুদ্ধ স্বপ্নে জ্ঞান-গুহ্য-বজ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন — (তন্ত্র)-জীবনের প্রতি তোমার এত মোহ কিসের? কেন তুমি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করোনি?

ভন্ত( শিষ্যের কাছে এ প্রশ্নের সদুত্তর ছিল না। তিনি মনে করলেন, যদি তিনি সদ্ধর্মে দী(া গ্রহণ করেন তবেই তা ধর্মসম্মত কাজ করা হবে। সেটাই বোধ করি তথাগত বুদ্ধের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়। একই সঙ্গে বোধকরি অনুভব করলেন — বজ্রযান কিংবা প্রচলিত তান্ত্রিক মতে বুদ্ধের ভাবনার ও দর্শনের যথাযথ অনুসরণ করা সম্ভব হবে না। তাহলে সাধক আত্মানুসন্ধান করুন এবং নতুন কর্মে উদ্যোগী হোন।

কুমার চন্দ্রগর্ভ তথা তান্ত্রিক গুহ্যজ্ঞানবজ্র নতুন করে দী(া গ্রহণে উন্মুখ হলেন। তন্ত্র-মন্ত্র ডাকিনী-যোগিনী গুহ্যজ্ঞান বজ্রজ্ঞান তান্ত্রিক আচার্যদের সঙ্গ ত্যাগ করে মূলানুগ ধর্মে দী(ার জন্য অধীর হলেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধযান থেকে প্রথাগত ধর্মভাবনায় উত্তরণকালে তাঁর বয়স কত ছিল? উনিশ না একুশ না উনত্রিশ? কখন তাঁর নতুন নামকরণ হয়েছিল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান? এ ব্যাপারে নানামুনির নানা মত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বুদ্ধচত্রে(র প্রথম বুদ্ধ হলেন দীপঙ্কর যিনি তিব্বতীভাষ্যে মারমেজ্যড। শেষ বুদ্ধ হবেন মৈত্রেয় বা চম্বা। ঐতিহাসিক বুদ্ধ তথাগত তিব্বতীদের কাছে শাক্যতুরপা বা শাক্যমুনি।

রাহুল সাংকৃত্যায়ণ বলেছেন — আচার্য জেতারি তাঁকে নালন্দার আচার্য বোধিভদ্রের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। বোধিভদ্র তাঁকে পাঠালেন অবধূতিপার কাছে। বারো থেকে আঠারো বৎসর বয়স অবধি শি(ালাভ করলেন অবধূতিপার কাছে। তারপর গেলেন নারোপার কাছে। তিন বৎসর পরে শি(ান্তে বুদ্ধগয়ায় বজ্রাসনের মাটিবিহারে গমন করলেন এবং বিনয়পিঠকের মহান ব্যাখ্যাতা, মহাবিনয়ধর আচার্য শীলর(িত, তাঁর শিষ্য হলেন। তাঁর কাছে উপসম্পদা প্রার্থনা করে ভি(ু দী(া গ্রহণ করলেন। আচার্য শীলর(িতের কাছে দুটি বৎসর বিনয়পিঠক অধ্যয়ন করেন। একত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি ত্রিপিটক ও তন্ত্রের শি(া সম্পূর্ণ করে একজন মহান পণ্ডিত রূপে মান্য হলেন।

গোস লোসাবের মতে — উনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি বিনয়চর্চায় একনিষ্ঠ, মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থবির এবং বজ্রাসনে মাটিবিহারে বুদ্ধজ্ঞানপাদ শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত( আচার্য শীলর(িতের নিকট দী(া গ্রহণ করেন। দী(ান্তে মহাসাংঘিক, সর্বাস্তিবাদী, সাম্মিতীয় ও স্থবিরবাদী ত্রিপিটক অধয়ন করেন। নিষ্ঠার সঙ্গে বিনয় চর্চা করেন। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেকার তত্ত্বগত ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে অবহিত হন। দুই বৎসর ধরে ওদন্তপুরী মঠ-মহাবিদ্যালয়ে শি(ক ধর্মর(িতের নিকট 'মহাবিভাষা' শ্রবণ করেন।



সুমপা অনেকাংশে গোস লোসাবের সঙ্গে একই মত পোষণ করে। উনত্রিশ বৎসর বয়সে গুরুর উপদেশত্র(মে এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নির্দেশানুসারে ওদন্তপুরী বিহারে মহাসাংঘিক আচার্য শীলর(িতের অধীনে প্রব্রজ্যা দী(া গ্রহণ করেন।

আচার্য শীলর(িত কি তখন ওদন্তপুরী বিহারে ছিলেন? নাকি বুদ্ধগয়ার বজ্রাসনের মাটিবিহারে?

শরৎ চন্দ্র দাসের জীবনীগ্রন্থ অনুসারে, তিনি ওদন্তপুরী বিহারের মহাসাংঘিক আচার্য শীলর(িতের নিকট উনিশ বৎসর বয়সে দী(াপ্রাপ্ত হন এবং তাঁর নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। একত্রিশ বৎসর বয়সে ধর্মর(িতের নিকট হতে সর্বোচ্চ স্তরের ভি(ু দী(া লাভ করেন এবং বোধিসত্ত্ব ব্রত প্রাপ্ত হন।

বোম তোনপা বলেছেন — তিনি এক মহাসাংঘিকের নিকট ভি(ু দী(া প্রাপ্ত হন।

আবার কেউ বলেছেন — তিনি মগধের ওদন্তপুরী বিহারের এক মহাসাংঘিক আচার্যের কাছে রীতি অনুসারে বৌদ্ধ-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সেই আচার্যের নাম ধর্মর(িত।

আচার্য শীলর(িতকে ধর্মর(িত নামেও নাকি ডাকা হয়। তবে আলোচ্য ধর্মর(িত ও শীলর(িত কি অভিন্ন ব্যক্তি( ? মনে হয় উভয়ে একই ব্যক্তি(।

নগোয়াং নিমার সূত্র অনুসরণ করে লামা চিমপা বলেছেন — উনত্রিশ বৎসর বয়সে মহাসাংঘিক শীলর(িতের নিকট তিনি ভি(ু দী(া গ্রহণ করেন। দী(ান্তে নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তারপর মহাযান শাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করেন। বিশেষ করে ওদন্তপুরী বিহারে গুরু ধর্মর(িতের নিকট 'মহাবিভাষা' শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে থাকেন। এই মহান শাস্ত্র আয়ত্ত করতে তাঁর অনেকটা সময় লেগেছিল। নাগার্জুন রচিত কঠিন শাস্ত্রাদির অধ্যয়নে তিনি জ্যেষ্ঠ বিদ্যাকোকিল, নালন্দার বোধিভদ্র, কনিষ্ঠ অবধূতিপা এবং গুরু প্রজ্ঞাভদ্রের নিকট বিশেষ উপদেশাদি লাভ করতে থাকেন। গুরু শান্তিপা এবং সুবর্ণদ্বীপীর নিকটও 'বিশিষ্ট-মার্গ-ত্র(ম' সম্পর্কে শি(ালাভ করেন। এই শি(া মৈত্রেয়নাথ এবং অসঙ্গ হতে অবতীর্ণ হয়েছিল। এভাবে সমগ্র মহাযান শাস্ত্র তাঁর অধিগত হতে থাকে।

প্রকৃতপ(ে আচার্য সুবর্ণদ্বীপীর নিকট শি(ালাভ পরবর্তী জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছিল। তাঁর কাছে বোধিচিত্ত সম্পর্কে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সে বর্ণনে পরে আসা যাবে।

ভি(ু দী(ালাভের পরে চন্দ্রগর্ভ তথা গুহ্য-জ্ঞান-বজ্রের নাম হয় 'দীপঙ্কর' বা 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান'। অবশিষ্ট জীবনকাল তিনি এই নামেই পরিচিতি লাভ করেন। তান্ত্রিক দী(ানাম 'গুহ্যজ্ঞানবজ্র' চিরকালের জন্য বর্জিত হয়। পারিবারিক নাম চন্দ্রগর্ভ তো কবেই হারিয়ে গিয়েছে বিস্মৃতি ও সংশয়ের গর্ভে।

ভি(ু হওয়ার পরে তিনি বৌদ্ধধর্মের আধ্যাত্মিক বিষয় অনুধাবন করতে নানা শাস্ত্রপাঠ করতে থাকেন। অধ্যয়ন করেন মূল ত্রিপিটক শাস্ত্র, 'মহাবিভাষা' বা 'অভিধর্মবিভাষা'।

চতুর্থ মহাসংগীতির পরে সম্রাট কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্যাত্যায়নিপুত্রের 'জ্ঞানপ্রস্থান' গ্রন্থের উপর টীকাকারে এক বিভাষা শাস্ত্র রচিত হয়েছিল। তিন ল( শ্লোকের সুবৃহৎ টীকাগ্রন্থ রচনায় আচার্য বসুমিত্র ও দার্শনিক অশ্বঘোষের অবদান ছিল। আচার্য বসুবন্ধু 'অভিধর্মকোষ' নামে বৃহৎ টীকাগ্রন্থ রচনা করেন। বৈভাষিক মতবাদের প্রবক্ত(া হিসেবে বসুমিত্র, ঘোষক, বুদ্ধদেব, ধর্মত্রাত ইত্যাদির নাম সুপরিচিত। তৃতীয় শতকের আচার্য এবং গুরু আর্যদেবের শিষ্য ধর্মত্রাত 'মহাবিভাষা'-র রচনাকার ছিলেন।

তান্ত্রিক জীবনকালে এই সকল প্রধান শাস্ত্রাদি সঠিকভাবে পাঠ করা হয়নি। ত্রিপিটকও চার সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক ভাষ্যে রচিত হয়েছিল – মহাসাংঘিক, সর্বাস্তিবাদী, সাম্মিতীয় ও স্থবিরবাদী সম্প্রদায়ের ভাষ্যে। মহাসাংঘিক পিটক লিখিত হয়েছে প্রাকৃত ভাষায়, সর্বাস্তিবাদীদের মিশ্র সংস্কৃত ভাষায়, সাম্মিতীয়দের অপভ্রংশে এবং স্থবিরবাদীদের পালিতে। সম্প্রদায় বিশেষে পৃথক ভাষ্যপাঠ গভীর জ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।

বুতোনের 'চোস-বাইয়ুং' অনুসারে সপ্তম শতকে আচার্য শান্তিদেবই মূল মহাযান ধর্মমতের শেষ আচার্য। তাঁর পরে আর তেমন উল্লেখযোগ্য কোন আচার্যের নাম শোনা যায় না। সেই সময় থেকে দশম-একাদশ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন তান্ত্রিক মতবাদে বৌদ্ধধর্ম সমাচ্ছন্ন ছিল। মূল শাস্ত্রাদির পঠনপাঠন বর্জিত হয়ে পড়েছিল। সেকারণে মূল বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য দর্শন অধ্যয়ন করতে প্রাচীন গ্রন্থসকলই ছিল একমাত্র ভরসা।

দীপঙ্কর উনত্রিশ বৎসর বয়সে উপসম্পদা দী(া এবং ত্রিশ বৎসর বয়সে আচার্য শীলর(িত দ্বারা বোধিসত্ত্ব ব্রতে উদ্বুদ্ধ হন। তারপর থেকে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের সামগ্রিক জ্ঞান আহরণে সচেষ্ট থাকেন। আর একত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই বিনয়পিটক-সুত্তপিটক-অভিধম্মপিটক নামের ত্রিপিটক শাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করেন। শুধু তাই নয়। তখন বৌদ্ধধর্ম যেমন হীনযান-মহাযান মতে বিভক্ত( হয়েছিল তেমনি হীনযান-মহাযান মতও দুটি প্রধান মতে বিভক্ত( হয়েছিল। হীনযান জন্ম দিয়েছে সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মতের। মহাযান দিয়েছে মাধ্যমিক ও যোগাচার মতের। দীপঙ্কর এই চার মতবাদের দার্শনিক ভাবনা আত্মস্থ করেছিলেন। সময় নিয়েছিলেন মাত্র দুই কি তিন বৎসর। এত অল্প সময়ের মধ্যে সুবিপুল বৌদ্ধশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করা সহজ কথা নয়।

সাধন চন্দ্র সরকার বলেছেন – তিনি থেরবাদী পণ্ডিত ধর্মর(িতের নিকট দুই বৎসরকাল অধ্যয়ন করেন। উনিশ বৎসর বয়সে আচার্য শীলর(িতের নিকট দী(া গ্রহণ করেন।

একথা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি এগারো বৎসর ধরে মূল শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করার মতো সময় পেয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে বিশাল বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য মাত্র দুটি বৎসর সময় খুবই সামান্য বলে মনে হয়। এগারো বৎসরকাল সে হিসেবে অধিকতর সঠিক মনে হয়। আবার যেহেতু উপসম্পদা দী(া বিশ বৎসরের পূর্বে দান করার বিধি নেই, তাই



উনিশ বৎসরে ভি( দী(া গ্রহণ হয়েছিল কি না তা নিয়ে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠে। আরো প্রশ্ন ওঠে। এই সময় তিনি কোন বিহারে বাস করছিলেন? কোন কোন বিহারে বা মহাবিদ্যালয়ে শাস্ত্রপাঠ করেছিলেন?

পূর্বভারতে তখন বেশ কয়েকটি মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সর্বাগ্রে নাম করতে হয় নালন্দা মহাবিহারের। নালন্দা মহাবিহার স্থাপন করেন নাকি সম্রাট অশোক যদিও গুপ্তযুগেই নালন্দার খ্যাতি ও সমৃদ্ধি। হর্ষবর্ধনের আমলেও তা বহাল ছিল।

বঙ্গদেশে বৌদ্ধবিরোধী রাজা শশাঙ্ক ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে মারা যান। অনন্তর ৬৫০-৭৫০ খৃষ্টাব্দ অবধি বঙ্গদেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা-অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। কিছুকাল পরে পালযুগের সূচনা হয়। ঐ সময় নালন্দার খ্যাতি প্রতিপত্তির কিঞ্চিৎ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। আমরা নালন্দা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাই সপ্তম শতকের হিউয়েন সাঙের কাহিনী থেকে। তার আগে ফাহিয়েনও নালন্দায় এসেছিলেন বটে তবে তখন এখানে মহাবিহার ছিল কিনা তা নিয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে। নালন্দা বিহার নরেন্দ্র বিহার নামেও পরিচিত।

পণ্ডিত তারানাথের মতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে আচার্য নাগার্জুন নালন্দার প্রধান পুরোহিত-আচার্য ছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে আর্যদেব, পঞ্চম শতকে অসঙ্গ, বসুবন্ধু ও দিঙনাগ নালন্দার শি( ক ছিলেন। সপ্তম শতকে আচার্য শীলভদ্র নালন্দার অধ্য( ছিলেন। তাঁর নিকট চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ অধ্যয়ন করেন। তখন অন্যান্য খ্যাতনামা আচার্যদের মধ্যে আচার্য ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতী, স্থিরমতী, প্রভামিত্র, জিনমিত্র ও জ্ঞানচন্দ্র সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আচার্য শান্তর(িত ও আচার্য পদ্মসম্ভবও নালন্দার সঙ্গে যুক্ত( ছিলেন।

দেখা যায়, মহাযান বৌদ্ধদর্শনের খ্যাতনামা প্রায় সকল শি( ক-আচার্যই নালন্দার সঙ্গে যুক্ত( ছিলেন। বৈদিক শি(া থেকে বৌদ্ধধর্মের সকল সম্প্রদায়ের শাস্ত্র ছাড়াও বিভিন্ন জ্ঞানের শি(া-কেন্দ্র ছিল নালন্দা। হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা ছিল। বজ্রযান চর্চার অন্যতম পীঠস্থানও ছিল নালন্দা। আগেই বলা হয়েছে পালযুগে নালন্দার সমৃদ্ধি পুনরায় স্থাপিত হয়েছিল।

নালন্দা ব্যতীত পালযুগে আরো কয়েকটি বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারমধ্যে বিক্র(মশীল বিহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্য দুটি বিহারের নাম ওদন্তপুরী ও সোমপুরী। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ এবং পরবর্তী সময়কালের পরিব্রাজক ইৎসিঙ নালন্দার নাম করেছেন। কিন্তু বিক্র(মশীল, ওদন্তপুরী বা সোমপুরী বিহারের নাম করেন নি।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সমকালে অন্যতম খ্যাতনামা বিহারের নাম বিক্র(মশীল কিংবা বিক্র(মশীলা বিহার। এই বিহারের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি। সম্ভবত

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে বিহারটি নির্মিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে রাজা ধর্মপালের নাম শোনা যায়। চরিত্র গৌরবের জন্য ধর্মপালদেবের এক উপাধি ছিল বিত্র(মশীলদেব। আবার 'বিত্র(ম' কথাটি শৌর্য প্রতাপ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শীল ব্যবহৃত হয় স্বভাব ও চরিত্র বোঝাতে। যেভাবেই ব্যাখ্যা করা যাক না কেন, রাজা ধর্মপালের প( একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করে বিত্র(মশীল নামকরণ করা খুবই সম্ভব।

তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথের বিবরণ অনুসারে মগধের উত্তরদিকে গঙ্গা নদীতীরের উপর এক পর্বতশিলার শিখরে বিত্র(মশীল বিহারটি অবস্থিত ছিল। কেন্দ্রস্থলে মহাবোধির পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপিত ছিল। তার চারদিকে তেপ্পান্নটি (দ্র মন্দির নির্মিত হয়েছিল গুহ্যতন্ত্র চর্চার জন্য। এ ছাড়া ছিল আরো চুয়ান্নটি সাধারণ মন্দির। সব মিলিয়ে সেখানে এক শত আট মন্দির ছিল। বাইরে প্রাচীর বেষ্টনী। রাজা ধর্মপাল বিহারের একশত আট জন পণ্ডিতের ভরণপোষণের দায়ভার বহন করতেন।

ধর্মপাল চৌষট্টি বর্ষকাল রাজত্ব করেন। কামরূপ, ত্রিহূত, গৌড় ইত্যাদি এলাকাসহ পূর্বদিশায় সমুদ্র সীমা এবং পশ্চিম দিশায় দিল্লি, উত্তর সীমায় জলন্ধর এবং দ( ণে বিন্ধ্য অবধি রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তখন সিংহপ্রভ ও জ্ঞানপ্রভ বিহারের গুরু ছিলেন। ধর্মপাল দশ দিক থেকে প্রজ্ঞাপারমিতা ও গুহ্যসমাজের পণ্ডিতদের সমবেত করছিলেন। তাঁর আমলে সিদ্ধ আচার্য কুকুরিপাদ (কুক্কুরিপা) মনুষ্যজগতের কল্যাণে ব্রতী। রাজা মোট পঞ্চাশটি বৌদ্ধ কেন্দ্র স্থাপন করেন। তার মধ্যে পঁয়ত্রিশটি নাকি কেবল প্রজ্ঞাপারমিতা চর্চার জন্য।

সুমপা অনুসারে, ধর্মপাল বিত্র(মশীল বিহারের প্রতিষ্ঠাতা। মগধের উত্তরে গঙ্গা নদীতটে এক পাহাড়চূড়ায় বিত্র(মশীল বিহার নির্মিত হয়েছিল। মধ্যে কেন্দ্রীয় সভা ঘিরে একশত সাতটি মন্দির ছিল। বাইরে প্রাচীর ছিল। একশত আট জন পণ্ডিত ছিলেন বিহারে। সেসময় প্রজ্ঞাপারমিতা ও (গুহ্য) সমাজের ব্যাপক চল ছিল। পশ্চিমদেশে তখন রাজা ছিলেন চত্র(ায়ুধ এবং তিব্বতে খ্রি-স্রং-দে-সান।

শরৎ চন্দ্র দাসের মতে ভাগলপুরের অন্তর্গত সুলতানগঞ্জ আলোচ্য বিহারের সম্ভাব্য স্থান। তিনি আরো বলেন, শ্রী নালন্দার আচার্য কম্পল মগধের রাজা ধর্মপাল রূপে জন্মগ্রহণ করেন। একদা আচার্য কম্পল গঙ্গাতীরে একটি পাথুরে ঢিবির গঠন দেখে আকৃষ্ট হন। রাজা হয়ে ধর্মপাল ঐ প্রস্তর-স্তূপের উপর বিত্র(মশীলা বিহার নির্মাণ করেন। রাজা ঐ বিহারে চারটি বিভাগ স্থাপন করেছিলেন। প্রত্যেক বিভাগে বৌদ্ধমতবাদের চার প্রধান সম্প্রদায়ের সাতাশজন করে সন্ন্যাসী নিযুক্ত( ছিলেন।

আরেক মতে বিত্র(মশীল বিহার সুলতানগঞ্জের নিকট পাথরঘাটার উঁচু শিলাস্তরে অবস্থিত ছিল। রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে বিহারের নির্মাতা ধর্মপাল নয়, দেবপাল। কারণ হিসেবে বলেন, দীপঙ্কর রচিত 'রত্ন-করণ্ডোদ্‌ঘাত-নাম-মাধ্যমক-উপদেশ' গ্রন্থে বিত্র(মশীল মন্দিরের সঙ্গে দেবপালের নামও উল্লিখিত হয়েছে।



বিত্র(মশীল বিহারের প্রকৃত অবস্থান নিঃসংশয়ে জানা যায়নি এখনো। তবে সম্প্রতি ভাগলপুর জেলার আন্তিচক গ্রামে পাটনা বি(বিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিন্ধ্যে(রী প্রসাদ সিনহা যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন তা বিত্র(মশীল বিহারের বলেই অনেকের মনে হয়।

রাজানুকূল্য ব্যতীত বিহার চলে না। রজনী কান্ত চত্র(বর্তী লিখেছেন – বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁরা বিস্তর ভূমিদান করেন। মূল মন্দিরের সঙ্গে একশত সাতটি দেবমন্দির প্রাকার-বেষ্টিত ছিল। ছয়টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। শি( াদানের জন্য একশত পণ্ডিত নিযুক্ত( হয়েছিলেন। রাজা জয়পাল (নয়পাল?)-এর সময়ে বিদ্যালয়গুলি ছয় জ্ঞানী দ্বারপণ্ডিতের অধীনস্থ থাকত। তাঁদের পরাজিত না করে বিহারে প্রবেশাধিকার পাওয়া যেত না। জেতারিমুনি বিত্র(মশীলায় সত্র (হোস্টেল) স্থাপন করেছিলেন। সত্রে ছাত্ররা বিনামূল্যে আহার্য পেত। সংঘারামে আরো চারটি সত্র স্থাপিত হয়েছিল।

কথিত আছে অতীশ দীপঙ্কর চীবর ধারণের পরে দু'বছর তিনি ওদন্তপুরী মঠবিহারে আচার্য ধর্মর( িতের নিকট বিখ্যাত লোজোং (লো-বাইয়ং) অধ্যয়ন করতে থাকেন। প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি শুদ্ধ করার উপায় ঐ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে শান্তিপা, নারোপা, অবধূতীপা, ধর্মর( িত, রত্নাকর-শান্তি, দানশ্রী ইত্যাদি গুরুর কাছে তন্ত্রযান, হীনযান ও মহাযান শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন।

একদিন বজ্রযান-গুরু রাহুলগুপ্ত দীপঙ্করকে বললেন – কতগুলি শুদ্ধ দর্শন লাভ হয়েছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্নেহপূর্ণ প্রেম, সহৃদয় সহানুভূতি, এবং বোধিচিত্ত উন্নত করতে ত্র(মান্বয়ে অভ্যাস করে যেতে হবে। লোকহিতের জন্য এবং জ্ঞানালোকিত হওয়ার জন্য। এটাই সারকথা।

গুরুর কথা তাঁর মনে রেখাপাত করেছিল নিশ্চয়ই। তারপর বোধগয়ার বজ্রাসনে উপাসনায় গিয়ে যখন বোধিবৃ( ও বোধিমণ্ড পরিত্র(মা করছিলেন, মন্দিরের কুলুঙ্গীতে আসীন সারি সারি মূর্তির মধ্যে দুটি মূর্তি পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে শুনতে পেলেন।

– যদি তাড়াতাড়ি আলোকপ্রাপ্ত হতে বাসনা করো, তবে কোন বিষয়ে চর্চা করতে হবে জানো?

– সম্পূর্ণরূপে হৃদয় নিবেদন করে বোধিচিত্তের চর্চা করতে হবে।

বিস্মিতচিত্তে দীপঙ্কর যখন মন্দিরের উপরস্থিত শিখর পরিত্র(মা করছিলেন তখন. স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে বললেন – ওহে ভি( সন্ন্যাসী, যদি তুমি তাড়াতাড়ি পূর্ণ (মতা অর্জন করতে চাও, তবে প্রেম, সহানুভূতি এবং বোধিচিত্ত চর্চা করো।

বোধিচিত্ত চর্চা!

# ৬। সুবর্ণদ্বীপ পর্ব
## (১০১৩-১০২৫ খৃঃ)

এশিয়া মহাদেশের দ( ণ-পূর্বে দ্বীপময় ভূমি ছড়িয়ে আছে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী এলাকা জুড়ে। মহাদেশ থেকে খানিকটা স্থলভাগ লেজুড়ের মতো দ( ণে বিস্তৃত মায়ানমার (বার্মা), থাইল্যাণ্ড (শ্যাম), কাম্বোডিয়া (কাম্বোজ), মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর নামাঙ্কিত দেশগুলি ব( ধারণ করে। দ( ণের ইন্দোনেশিয়া গঠিত সুমাত্রা, জাভা, বালি ইত্যাদি দ্বীপাবলি নিয়ে।

প্রাচীনকালে জাভা-সুমাত্রা অঞ্চলকে সুবর্ণদ্বীপ বা সুবর্ণভূমি বলা হত। কখনো মায়ানমার তথা বার্মাকেও সুবর্ণভূমি বলা হত। আবার মেনাম-চাও-ফায়ার মুখের কাছে অবস্থিত দ( ণ শ্যামদেশকেও বলা হত সুবর্ণভূমি। আসলে বার্মা, শ্যাম, কম্বুজ, চম্পা ইত্যাদি দ( ণ-পূর্ব এশিয়ার ভূখণ্ড, তৎসহ সুমাত্রা-জাভা-বালি ইত্যাদি দ্বীপাবলি নিয়ে সমগ্র অঞ্চলকে সামগ্রিকভাবে অথবা বিচ্ছিন্নভাবে সুবর্ণভূমি বলা হয়েছে। ফলে কোন স্থান কার বর্ণনায় সুবর্ণভূমি, তা নির্ণয় করা মুস্কিল। চিনারা সুবর্ণভূমিকে বলেছে 'সানফাৎসি' বা 'সানফোকি'।

সংস্কৃত-পালিতে 'যবদ্বীপ' বলা হয়েছে মূলত সুমাত্রার পূর্বদিকে অবস্থিত প্রায় লাগোয়া দ্বীপ জাভাকে। আরবদের কাছে সেটাই 'জাবাগ'। তবে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জীবনের সঙ্গে যে সুবর্ণভূমি জড়িয়ে আছে, তার সঠিক অবস্থান বার্মা বা জাভা নয়, সুমাত্রার কোন এলাকায়।

ভগবান বুদ্ধের তিরোভাবের পরে সম্রাট অশোকের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল সমগ্র ভারতভূমে। এবং ভারতবর্ষের বাইরে শ্রীলঙ্কায়। দ( ণ-পূর্ব এশিয়ায় ধর্মপ্রচারের ইতিহাস সবটা উদ্ঘাটিত হয়নি এখনো।

এশিয়া ভূখণ্ডে ভারত-সংলগ্ন দেশ বার্মা, শ্যাম দেশ, মালয়, কম্বোজ তথা কাম্বোডিয়া ও লাওস এবং ভিয়েতনাম। দ( ণে দ্বীপমালার সারি – সুমাত্রা, জাভা, বালি, বোর্নিও নিয়ে অজস্র দ্বীপদেশ। এসব অঞ্চলে ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হয়েছিল অনেক কাল আগে। কবে তা বলা মুস্কিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে ভারত ও পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সমৃদ্ধ বাণিজ্যব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সভ্যতার প্রসার তারই সূত্র ধরে। তৃতীয় বৌদ্ধসংগীতির পরে সোণ থের এবং উত্তর থের সুবর্ণভূমিতে গমন করেছিলেন।

সামগ্রিকভাবে যদি ইন্দোনেশিয়াকে সুবর্ণদ্বীপ বলা যায় তবে সেদেশে চতুর্থ শতক থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করে। ৪১৪ খৃষ্টাব্দে চিনা পর্যটক ফাহিয়েন সমুদ্রপথে ভারতের তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে চিনে প্রত্যাগমন করেছিলেন। তিনি সিংহল হয়ে যাত্রা করেছিলেন



স্বদেশাভিমুখে। যাত্রাপথে পাঁচ মাস সুমাত্রার পূর্বদিকের দ্বীপভূমি জাভাতে বাস করতে হয়েছিল। সেখানে তিনি হিন্দুধর্মের প্রাধান্যই ল( ্য করেন। তবে বৌদ্ধধর্মের প্রচলনও ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। অল্পকাল পরে এক ভারতীয় ভি( , গুণবর্মন, চিন যাত্রাপথে জাভাদ্বীপে উপস্থিত হয়েছিলেন।

অনুমান করা হয় যে ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় শ্রীবিজয় নামের এক প্রাচীন মালয় রাজ্যের পত্তন হয় সুমাত্রার পালেমবাং এলাকা কেন্দ্র করে উপকূলবর্তী অঞ্চলে। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। মুসি নদীর উজান এলাকা ঐ বন্দরের পশ্চাৎভূমির কাজ করছিল। রাজ্যের অন্য আরেকটি ( মতাকেন্দ্র ছিল পশ্চিমের জামবি এলাকায়।

৬৮৩ খৃষ্টাব্দে রচিত 'কোডুকান-বুকিট লেখ'তে পালেমবাং নামক স্থান কেন্দ্র করে শ্রীবিজয় রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির কথা উল্লিখিত হয়েছে। তা থেকে জানা যাচ্ছে যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে সুবর্ণদ্বীপে শ্রীবিজয় এক শক্তি(শালী রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যের রাজধানীর নামও ছিল শ্রীবিজয়। অন্য নাম হয়তো বিজয়নগর।

পালেমবাং বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। একদা প্রাচীন সুমাত্রার রাজধানী ছিল। সম্ভবত মুসি নদী বরাবর বুকিট-সেগানতাং ও সাবোকিংকিং নামের দ( ণ সুমাত্রার দুটি এলাকার মধ্যে রাজ্যটি বিস্তৃত ছিল। অন্য সূত্রমতে শ্রীবিজয় রাজ্যের অবস্থান সুমাত্রার মিনাগবাকু ও বাটক জেলায়। কোন কোন সময় শক্তি(শালী শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যটি সম্প্রসারিত হয়ে কম্বোজ, শ্যাম, সিংহল, জাভার অধিকাংশ, বোর্নিওর উপকূল এলাকা, বেঞ্জারমাসিন-ব্রুনেই হয়ে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অবধি বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

প্রাচীন মালয় ভাষায় যে চারখানি লেখ পাওয়া যায়, তা থেকেও জানা যায় শ্রীবিজয় সপ্তম শতকে শক্তি(শালী রাজ্য ছিল। তখন সেদেশে বৌদ্ধধর্ম চর্চিত হত। ৬৮৪ খৃষ্টাব্দের একখানি লেখতে 'জয়নাস' নামে শ্রীবিজয়ের এক বৌদ্ধ রাজার নাম উল্লিখিত হয়েছে। সম্পূর্ণ নাম 'দাপুন্ত হায়াং শ্রীজয়নাস'। ইনি বিশ হাজার সেনা ও কয়েক শত রণতরী নিয়ে মিনাংগা তাংওয়ান (সম্ভবত মিনাংকাবায়ু) থেকে সুমাত্রার জামবি (মালায়ু) ও পালেমবাং অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেন এবং বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মালায়ু তখন ছিল স্বর্ণসম্পদে অধিকতর ধনী অঞ্চল। ভ্রমণকারীরা বলেছেন, সুবর্ণদ্বীপের উপকূল অঞ্চলে স্বর্ণমুদ্রাই প্রচলিত ছিল। অন্তর্দেশে নয়।

চিনা পরিব্রাজক ইৎসিং (ই-চিং, ৬৩৫-৭১৩ খৃঃ) একাধিকবার সুমাত্রা ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর দী( া-পূর্ব নাম বোধকরি ঝাং ওয়েন মিং। সপ্তম শতকে, সঠিকভাবে বলতে হলে ৬৭১ খৃষ্টাব্দে, চিনা পর্যটক ইৎসিং ভারত যাত্রাপথে শ্রীবিজয় দ্বীপরাজ্যে পদার্পণ করেন। তাঁকে সাহায্য করেছিল ফঙ নামের এক অজ্ঞাত পরোপকারী। তিনি পারস্য দেশীয় বাণিজ্য জাহাজে করে ভারতযাত্রা করেন। দেশ ত্যাগ করে বাইশ দিন পরে

সুমাত্রা দ্বীপে উপনীত হন। সুমাত্রা সহ অন্তত দশটি দ্বীপে তিনি বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করেন। সেসময় সুমাত্রার শ্রীবিজয় রাজ্যে মহাযান ধর্মের এবং অনান্য দ্বীপগুলিতে হীনযান ধর্মের প্রাধান্য ছিল। শ্রীবিজয়ে ছয় মাস অবস্থান করে ইৎসিং শব্দবিদ্যা (সংস্কৃত ব্যাকারণ) শি(া করেন। আর প্রায় দু'বছর পরে ভারতের উপকূলে তাম্রলিপ্ত বন্দরে অবতরণ করেন। তা থেকে মনে হয় তিনি আরো নানা স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন।

চৌদ্দ বছর পরে স্বদেশে ফেরার পথে আবার সুমাত্রা দ্বীপে যাত্রা ভঙ্গ করেন। সেবার দু'বছরের জন্যে সুমাত্রায় ছিলেন। তখন শ্রীবিজয় রাজ্যে মহারাজ জয়নাসের রাজত্ব চলছিল। তারপর ৬৮৯ খৃষ্টাব্দে চিনে প্রত্যাগমন করেন। ঐ বছরে আবার সুমাত্রা ফিরে আসেন চিন থেকে কালি-কাগজ সংগ্রহ করে।

ভারত থেকে তিনি যত শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন, সেসবের প্রতিলিপি ও অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করতে কর্মস্থান হিসেবে শ্রীবিজয় রাজ্যকে নির্বাচন করেছিলেন। যুক্তি( দেখিয়েছেন – স্থানীয় রাজারা এবং সমাজ-প্রধানগণ বৌদ্ধধর্মে গভীর আস্থা পোষণ করেন। সুদৃঢ় ভোগ নগরদুর্গে (শ্রীবিজয়-দুর্গ) সহস্রাধিক বৌদ্ধ পুরোহিত আছেন। তারা শি(ায় আগ্রহী এবং সদাচারী। জম্বুদ্বীপের (অর্থাৎ ভারতের) মধ্যদেশে যত বিষয় আছে সেসবের আলোচনা চর্চা করতে তারা পারদর্শী। উভয় দেশের রীতিনীতি উৎসবাদি প্রায় একই রকমের। তিনি আরো বলেছেন যে চৈনিক শ্রমণ-ভি(ুরা যদি পশ্চিমে দিশায় ভারতে শি(ালাভের জন্য যাত্রা করতে আগ্রহী হন, তবে দু'এক বছরের জন্য তাদের শ্রীবিজয় রাজ্যে পাঠাদির অভ্যাস করা উচিতকার্য হবে। তিনি আরো বলেছেন – জাভার হোলিং রাজ্যের অবস্থান ভোগের পূর্বদিকে – জলপথে চার-পাঁচ দিনের পথ।

এরপর আরো একবার ক্যান্টন থেকে চারজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সুমাত্রা ফেরেন। সাকুল্যে প্রায় পঁচিশ বৎসর নানা দেশে ভ্রমণ করে ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে শেষবারের মতো দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সঙ্গে প্রায় চারশত বৌদ্ধ গ্রন্থ। তিনি চিনা ভাষায় ষাটখানি সূত্র অনুবাদ করেছেন। লিখে গিয়েছেন – 'নান-হাই-চি-কুয়েই-ফা চুয়ান' (দ(িণের দ্বীপদেশে বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের কথা) নামে মূল্যবান একখানি গ্রন্থ।

শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য যখন সুমাত্রায় (মতাশালী, তখন মধ্য জাভায় শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে প্রথমের দিকে সুসম্পর্ক ছিল।

জাভায় হয়তো একাধিক ভারতীয় সংস্কৃতি ঘেঁষা রাজত্ব কায়েম হয়েছিল। পঞ্চম শতকে সেরকম দুটি রাজ্যের কথা জানা যায় – চো-পো এবং হো-লো-তান। তারা চিনে রাজদূত পর্যন্ত পাঠিয়েছিল। ঐ শতকে পশ্চিম জাভায় পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে প্রাপ্ত লেখ থেকে জানা যায় যে তরুমানগর রাজ্যে পুণ্যবর্মন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পিতামহের নাম রাজশ্রী ও প্রপিতামহের নাম রাজাধিরাজ।



সপ্তম শতকে সুমাত্রায় দুটি এবং জাভায় তিনটি রাজ্যের কথা জানা যায়। ঐ শতকে নালন্দা থেকে বৌদ্ধভি(ু ধর্মপাল গিয়েছিলেন শ্রীবিজয় রাজ্যে।

অষ্টম শতকের শেষে অন্তত জাভার দুটি রাজ্য, তরুমানগর ও হোলিং, শ্রীবিজয়ের প্রভাবাধীন ছিল। সেসময় শ্রীবিজয়ের এক বৌদ্ধপরিবার মধ্য জাভায় (মতাসম্পন্ন হয়ে ওঠে। তারা সম্ভবত শৈলেন্দ্র বংশীয় ছিলেন। 'কোটাকাপুর লেখ' অনুসারে এরা দ(িণ সুমাত্রার অনেকটা জায়গা দখল করে নেয়। ফলে মালাক্কা প্রণালী, দ(িণ চিন সাগর, জাভা সাগর ও করিমাতা প্রণালীতে এই গোষ্ঠী ত্র(মে ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম নিয়ন্ত্রক শক্তি( হয়ে ওঠে।

এদিকে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যও মালয় উপদ্বীপের লাংকাসুকা এবং উত্তরের পনপন ও ত্রামব্রালিংগ অঞ্চলে প্রসারিত হয়। শ্যামদেশের 'চাইয়া সুরাট থানি' এলাকাও নাকি তাদের প্রভাবাধীন ছিল। সম্ভবত শ্রীবিজয়ের রাজা ধর্মসেতু ইন্দোচিনের পূর্ব উপকূলে অভিযান চালিয়েছিলেন। রাজা সমরতুঙ্গা (৭৯২-৮৩৫ খৃঃ)-র আমলে রাজধানী জাভায় বিখ্যাত বরবুদুর নির্মিত হয়। আসলে নির্মাণ শুরু হয় পঞ্চান্ন বছর আগে। শেষ হয় ৮২৫ খৃষ্টাব্দে। অষ্টম শতকের শেষার্দ্ধে শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা মধ্য সুমাত্রায় রাজ্যবিস্তার করতে স(ম হয়েছিলেন। নবম শতকে তারা আরো প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। শৈলেন্দ্র রাজারা মহাযান ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রীবিজয় রাজ্যে সম্ভবত বজ্রযানের প্রাধান্য ছিল।

নালন্দায় প্রাপ্ত লেখ থেকে জানা যায় – ৮৬০ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণদ্বীপের তথা যবদ্বীপের রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় বিহার নির্মাণ করেন এবং বিহারের ব্যয়নির্বাহের জন্য পালরাজা দেবপালদেবকে অনুরোধ জানান। তাঁর অনুরোধত্র(মে রাজা দেবপাল পাঁচ খানি গ্রাম দান করেছিলেন। কথিত আছে শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব জাভা থেকে বিতাড়িত হয়ে শ্রীবিজয়ের সিংহাসন দখল করেছিলেন। ৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি চিনে রাজদূত প্রেরণ করেন। একই সময় জামবির রাজাও বোধহয় স্বাধীন শাসক হয়ে ওঠেন। জামবি স্বর্ণখানির জন্য বিখ্যাত। জামবি স্বাধীন হলেও শ্রীবিজয়ের সমৃদ্ধি অটুট ছিল। ৯০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলিম লেখক ইবন রুসতাহ শ্রীবিজয় রাজ্যের সমৃদ্ধিতে এতই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর মতে সে রাজ্যের রাজার থেকে আরো ধনী রাজার কথা কল্পনা করাও ছিল শক্ত(। দেশের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল পালেমবং (বিশেষত বুকিট-সেগানতাং এলাকা), মুয়ারা জামবি ও কেডাহ।

দশম-একাদশ শতকে মালয় উপদ্বীপ ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ স্থান নিয়ে গঠিত শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অঙ্গ হয়ে পড়েছিল পূর্বতন শ্রীবিজয় রাজ্য। শৈলেন্দ্র রাজত্বের সঙ্গে দ(িণ ভারতের চোল সাম্রাজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। শুরুতে চোল রাজাদের সঙ্গে শৈলেন্দ্র রাজাদের সম্পর্ক মধুর ছিল। তামিল এক শিলালেখতে বর্ণিত রয়েছে – 'চোলসম্রাট রাজারাজ তাঁর রাজত্বকালের একুশতম বর্ষে কড়ারামের (?) রাজা চূলামণিবর্মন

নাগাপট্টনমে যে চূলামণিবর্ম-বিহারে বুদ্ধমন্দির নির্মাণ করছিলেন তার র( ণাবে( ণের জন্য একটি গ্রামের খাজনা দান করলেন।'

সংস্কৃতে উল্লিখিত রয়েছে – 'রাজারাজ একুশ-তম রাজত্বকালে নাগীপট্টনের চূলামণিবিহারে শ্রীমারবিজয়োত্তুঙ্গবর্মন দ্বারা পিতা চূলামণিবর্মনের নামে যে বুদ্ধমন্দির নির্মাণ করছিলেন তার ব্যয় নির্বাহের জন্য গ্রামদান করেছেন। শ্রীমারবিজয়োত্তুঙ্গবর্মন শৈলেন্দ্র রাজপরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি শ্রীবিজয়ের প্রভু। কঠহ (কেডাহ) পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত। তাঁর পতাকায় রচিত থাকে মকর লাঞ্ছন।'

চোল বংশীয় রাজারাজের রাজত্ব শুরু ৯৮৫ খৃষ্টাব্দে। একুশতম বর্ষ তাহলে ১০০৬ খৃষ্টাব্দকে ধরা যেতে পারে। রাজারাজের অন্তিমকাল নিয়ে মতভেদ আছে – তা ১০৩৫, ১০১৬ বা ১০১৪ খৃষ্টাব্দ হতে পারে। শৈলেন্দ্রবংশীয় শ্রীচুড়ামণিবর্মদেব ৯৮৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০০৮ খৃষ্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন। তামিল লিপিতে কথিত চূলামণিবর্মন আসলে এই চূড়ামণিবর্মনই হবেন। তাঁর পুত্র শ্রীমারবিজয়োত্তুঙ্গবর্মন ১০১৭ খৃষ্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন। তাঁর পরে শৈলেন্দ্র রাজ্যের সিংহাসনে বসেন পুত্র সুমাত্রাভূমি। এঁদের আমলেও রাজধানী ছিল সুমাত্রার পালেমবাং।

এই গেল সুমাত্রা-জাভার এক টুকরো ইতিহাস। যে সময়ের সঙ্গে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সময়কাল জড়িয়ে আছে, সেই সময়কালের কিছু কথা। বৌদ্ধধর্মে উদ্ভাসিত মানুষেরা বিদেশ থেকে ভারতভূমিতে পদার্পণ করে ধন্য হয়েছেন। কারণ ভারতই ছিল বৌদ্ধধর্মের পুণ্যতীর্থ এবং শি( াকেন্দ্র। ভারত থেকে ধর্মপ্রচার করতে অনেকে দেশেবিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু সে যুগে ভারত থেকে ধর্মশি( া করতে বিদেশে যাত্রা করেছেন – এ ছিল অতি বিরল ঘটনা। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ভারতভূমি থেকে সুবর্ণভূমি যাত্রা করেছিলেন শি( ালাভের জন্য। সুবর্ণদ্বীপের খ্যাতনামা আচার্য ধর্মকীর্তির নিকট অধ্যয়ন করতে।

প্রাথমিকভাবে শরৎ চন্দ্র দাস তিব্বতী সূত্র থেকে আচার্য ধর্মকীর্তির পরিচিতি উদ্ধার করেছিলেন। বর্তমানে আরো কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। সেসবের উপর ভিত্তি করে আমরা তাঁর সম্পর্কে সামান্য কিছু জানতে পেরেছি।

দশম-একাদশ শতকে সুবর্ণদ্বীপের প্রধান পুরোহিত রূপে গণ্য হয়েছিলেন আচার্য ধর্মকীর্তি। তাঁর পাণ্ডিত্য-খ্যাতি দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিব্বতী গ্রন্থে তাঁকে বলা হয়েছে লামা 'সেরিলিংপা'। সেরিলিংপা কথার অর্থ সেরিলিং-এর মানুষ বা 'সুবর্ণদ্বীপী'। তাঁর তিব্বতী নাম 'চোস-কাই-গ্রাগস-পা' বা 'ধর্মকীর্তি'। তিনি ধর্মপাল-ধর্মর( ত নামেও সুপরিচিত।

বৌদ্ধ কাহিনীতে একাধিক ধর্মপাল আছেন। একজন বিজ্ঞানবাদী ধর্মপাল বসুবন্ধুর উপর ভাষ্য রচনা করেছেন। আরেকজন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের তিব্বত যাত্রার অব্যবহিত



পূর্বে তিব্বতে গমন করেছিলেন। আরেকজন ধর্মকীর্তি আছেন যিনি অন্যতম একজন বৌদ্ধ যুক্তি( বাদী তর্কবিদ।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের গুরু ধর্মকীর্তি সুবর্ণদ্বীপেরই কোন এক রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, তিনি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তিনটি পবিত্র বস্তুর কথা বলতে বলতে 'সিন সিন' করে কেঁদে উঠেছিলেন।

তখন সে দেশে তীর্থিকদেরই প্রাধান্য ছিল। বৌদ্ধধর্ম নয়। তরুণ বয়সে পর্বতগুহায় ঘুরতে এসে শাক্যবুদ্ধের ঢালাই-করা একখানি মূর্তি ধর্মকীর্তির নজরে পড়েছিল। মূর্তি উদ্ধার করে গৃহে নিয়ে গেলেন। দিনে দিনে ঐ শাক্যবুদ্ধের মূর্তির প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ জন্মাতে লাগলো। তিনি মূর্তির পূজার্চনা শুরু করলেন। এভাবে ধীরে ধীরে তথাগত বুদ্ধ ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের প্রতি অনুরাগ জন্মালো। কেমন করে যেন সেই অনুরাগ বিস্তৃত হল দেশবাসীর অন্তরেও। রাজ্যবাসীর আশ্চর্য ধারণা হল – এই যে দেশে ফসল ভালো হয়েছে এবং মহামারীর হাত থেকে দেশ র( া পেয়েছে, এসবের কারণ নাকি ধর্মকীর্তির ঐ বুদ্ধপূজা। ত্র( মে সুবর্ণদ্বীপের অধিবাসীর মনে বুদ্ধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জন্মালো।

রাজকুমার ধর্মকীর্তি জম্বুদ্বীপে গিয়ে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে পিতার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। অনুমতিলাভের পর সমুদ্রপথে যাত্রা করে উপনীত হলেন বুদ্ধগায়ার বজ্রাসনে। সেই সময় এক রা( সও এসেছিল নাকি বোধগয়ার মহাবোধিতে। রা( স বলতে আসলে হয়তো জনৈক সিংহলী ভক্ত( কে বোঝানো হয়েছে।

সেবার বজ্রাসনের মহাবিহারে বৌদ্ধজগতের আরো অনেক জ্ঞানীগুণীর সমাগম হয়েছে। তার মধ্যে ছিলেন পরমাচার্য মহাশ্রীরত্ন। তিনি দীর্ঘজীবন লাভের বিরল ( মতা অর্জন করেছিলেন। রাজপুত্র ধর্মকীর্তি আচার্য মহাশ্রীরত্নের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। শুধু তাই নয়, তিনি এমন গভীরভাবে শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁকে ছাড়া আর কাউকে বি( াস করতে পারছিলেন না। অথচ মাত্র সাতটা দিন আচার্যের সঙ্গে ছিলেন। আর ঐ সাতদিনের মধ্যে রাজকুমারের আশ্চর্য পরিবর্তন হল। একদিন আচার্য মহাশ্রীরত্ন বজ্রাসন বিহার থেকে কোথায় চলে গেলেন কে জানে! একপ্রকার অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সুবর্ণদ্বীপের রাজকুমার তাঁকে খুঁজতে লাগল নৈরঞ্জনা নদীতটে। খুঁজলেন বারাণসীতে। কপিলাবাস্তুর লুম্বিনী কাননে গেলেন তাঁর সন্ধানে। কোথাও সেই সন্ন্যাসীর সংবাদ পেলেন না।

জম্বুদ্বীপে আরো কিছুদিন বসবাস করে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে মনস্থ করলেন। গেলেন বিত্র( মশীল বিহারে। বৌদ্ধধর্ম ও নানা প্রকার বিজ্ঞান নিয়ে অধ্যয়ন করলেন। বিভিন্ন গুরু ও সাধুসন্ন্যাসীর কাছে শি( ালাভ করলেন। ইতিমধ্যে সাত সাতটা বৎসর গত হল।

একদিন স্বপ্নে আচার্য মহাশ্রীরত্ন দেখা দিলেন। বললেন – রাজার ভূমিকা পুণ্যময় নয় বটে, তবে অবজ্ঞা করারও নয়। রাজকুমার হয়ে তবু কি ধর্মরাজ্য কামনা করো?

রাজকুমার উত্তর দিলেন – হ্যাঁ।

তিনবার একই প্রশ্ন করা হল তাঁকে। তিনবার তিনি একই উত্তর দিলেন।

নিদ্রাভঙ্গ হলে দেখলেন তাঁর একান্ত প্রার্থিত গুরু মহাশ্রীরত্ন তাঁর পাশে বসে। অনন্তর গুরুর আশীর্ব্বাদ লাভ করে বৌদ্ধ ত্রি(য়াকর্ম ও সাহিত্যে প্রভূত পারদর্শী হয়ে উঠলেন। সন্ন্যাস-মার্গে সাফল্যের রহস্যকৌশল করায়ত্ত হল। রাজকুমার অন্যান্য গুরুর কাছ থেকে প্রভূত জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তাঁর নতুন নাম হল ধর্মকীর্তি। সুবর্ণদ্বীপের অধিবাসী বলে পরিচিত হলেন সুবর্ণদ্বীপের ধর্মকীর্তি নামে। সর্বজনে মৈত্রীভাব প্রবল ছিল বলে তাঁকে 'মৈত্রী'ও বলা হতে লাগল। মোট বারো বৎসর ধরে বিত্র(মশীল বিহারে অধ্যয়ন করলেন। পাঠান্তে দেশে প্রত্যাগমন করবেন বলে তৈরী হলেন।

একরাতে গুরু মহাশ্রীরত্ন আবার তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। বললেন – বৌদ্ধভি(ুর রাজা হওয়া ধর্মসম্মত কাজ নয়।

গুরুর নির্দেশ অমোঘ। আগেই তিনি ধর্মরাজ্য কামনা করেছেন। রাজত্ব নয়। সেকথা স্মরণ রেখে ধর্মকীর্তি দেশে ফিরে আর রাজা হলেন না। ধর্মচর্চায় জীবনব্যয় করতে লাগলেন। সুবর্ণভূমির তীর্থিকদের বৌদ্ধধর্মে আকর্ষণ করতে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। সুবর্ণদ্বীপে বাস করলেও জম্বুদ্বীপে পর্যন্ত তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

ধর্মকীর্তির 'অভিসামান্য-অলঙ্কার-নাম-প্রজ্ঞাপারমিতা-উপদেশ-শাস্ত্র-বৃত্তি-দুর্বোধ-আলোক-নাম-টীকা' নামক গ্রন্থটি তিব্বতী তাঙ্গুরে উল্লিখিত আছে। ঐ গ্রন্থের পিকিং সংস্করণে বলা হয়েছে – 'সুবর্ণদ্বীপে বিজয়নগরের রাজা চূড়ামণিবর্মনের দশম রাজ্যাঙ্কে রাজা চুড়ামণিবর্মণের অনুরোধে আচার্য ধর্মকীর্তি কর্তৃক রচিত'। গ্রন্থটি তিব্বতী ভাষ্যে অনুবাদ করেছেন উপাধ্যায় পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও মহা-লোসাব ভি(ু রত্নভদ্র। তিব্বতী সূত্রে কিন্তু 'দুর্বোধালোক'-রচয়িতার নাম থেকে গিয়েছে আচার্য অতীশ।

আরেক সূত্রে কথিত হয়েছে 'সুবর্ণদ্বীপের বিজয়নগরের মলয়গিরিতে রাজা দেবশ্রীবর্মরাজা, চূড়ামণি, তথা চূড়ামণিমণ্ডপ, তাঁর রাজত্বকালে রচিত ...' ঐ গ্রন্থটি। মলয়গিরি পালেমবং-এর উত্তরে জামবি এলাকায় অবস্থিত।

উপরোক্ত( সূত্র অনুসারে ধর্মকীর্তি ছিলেন সুবর্ণদ্বীপের বিজয়নগর রাজ্যের অধিবাসী। রাজ্যের রাজার নাম চূড়ামণিবর্মন কিংবা দেবশ্রীবর্ম চূড়ামণি। তাঁর সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমরা কিছু কথা জেনেছি। সুতরাং সুবর্ণদ্বীপই যে সুমাত্রা-জাভা, তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

সুমপা অনুসারে, ধর্মকীর্তির প্রধান শিষ্যদের তালিকায় যারা রয়েছেন তাদের নাম শান্তি, জো-বো, জ্ঞানশ্রীমিত্র ও রত্নকীর্তি। আর ছিলেন সম্ভবত কমলর(ি তবে যদিও সুমপা-রচিত শিষ্যদের তালিকায় তাঁর নাম নেই।



ধর্মকীর্তি রচিত আরো পাঁচখানি গ্রন্থের নাম তিব্বতী তাঙ্গুরে উল্লিখিত আছে। তার মধ্যে 'ব্লো-বায়োং-শোন-চা খোর লো' (হুইল অব শার্প উইপেন্স) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গবেষিকা অলকা চট্টোপাধ্যায় যে গ্রন্থতালিকা তুলে ধরেছেন, তাতে ধর্মকীর্তি রচিত 'আর্য-অচল-সাধন-নাম' শাস্ত্রটির অনুবাদ করেন আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান একাই। শিষ্য কমলর(ি ত ও দীপঙ্করের অনুরোধে আচার্য ধর্মকীর্তি 'বোধিসত্ত্ব-চর্যাবতার-পিণ্ডার্থ', 'বোধিসত্ত্ব-চর্যাবতার-সত্রিংশত-পিণ্ডার্থ' এবং 'শি( া-সমুচ্চয়-অভিসময়-নাম' রচনা করেন। অনুবাদ করেন আচার্য দীপঙ্কর ও জয়শীল। তবে সেসব পরের কথা।

সুবর্ণদ্বীপের ধর্মকীর্তির অসীম জ্ঞানভাণ্ডারের কথা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান জেনেছিলেন। তিনিও জ্ঞানপিপাসু এবং জীবনপথে দুঃসাহসী অভিযাত্রী। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে আগ্রহী হলেন। বিশেষ করে বোধিচিত্ত সম্পর্কে তাঁর কাছে জ্ঞানলাভ করতে হবে। আচার্য ধর্মকীর্তি তখন মহাযান শাস্ত্রে ও বোধিচিত্ত-চর্চায় সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী।

মাত্র দু'বছর হল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দী( ান্তে বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি পাঠ করছেন। প্রকৃত শি( ার জন্য এবং গভীরতর জ্ঞানের জন্য যথোপযুক্ত( গুরু চাই। মহাগুরুর যেমন প্রয়োজন উপযুক্ত( শিষ্য তেমনি জ্ঞানলোভী শিষ্যের কামনা উপযুক্ত( গুরুর সাহচর্য। আদতে জ্ঞানের যেমন সীমা নেই, শি( ালাভের তেমনি কোন বয়স নেই। যে কোন বয়সে শি( ারম্ভ হতে পারে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পরিণত বয়সেও উপযুক্ত( গুরুর সন্ধানে রত। শাক্যমুনির সেরকম নির্দেশ লাভ করেছেন।

সেসময় আচার্য ধর্মকীর্তি কি বার্মার পেগু (বর্তমান নাম থাটোন) এর সুধর্মনগরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন? শরৎ চন্দ্র দাস তেমন কথাই বলেছেন। তিনি তাঁকে সুবর্ণদ্বীপের আচার্য চন্দ্রকীর্তি নামেও উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ পণ্ডিত আবার পেগুকে আলোচ্য সুবর্ণদ্বীপ হিসেবে গ্রহণ করতে নারাজ। আরেক সূত্র অনুসারে তিনি ছিলেন জাভার বোরবোদুরে। ধর্মকীর্তি তখন ঠিক কোথায় ছিলেন, কোন বিহারের সঙ্গে যুক্ত( থেকেছেন, তা নিয়ে প্রবল ধোঁয়াশা আছে।

সংবাদ পাওয়া গেল কয়েকজন রত্নবণিক শীঘ্রই জাহাজ নিয়ে সুবর্ণদ্বীপ যাত্রা করবে। দীপঙ্কর ঐ বণিকদলের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করতে মনস্থির করলেন। তাঁর সঙ্গে জুটে গেল আরো কয়েকজন যাত্রী। তখন তাঁর বয়স কত ছিল? সুমপা এবং অলকা চট্টোপাধ্যায়ের মতে তখন তাঁর বয়স ছিল একত্রিশ বৎসর। সময়কাল তাহলে ১০১২-'১৩ খৃষ্টাব্দ। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেছেন – তিনি সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন ১০১৩ খৃষ্টাব্দে।

সেসময় যন্ত্রচালিত জাহাজের আবিষ্কার হয়নি। বাষ্পীয় জাহাজের আবিষ্কারও কয়েক শতক পরের কথা। তখন সামুদ্রিক জাহাজ ছিল মূলত কাঠের নির্মাণ। মাস্তুলে বাধা হত

পাল। বায়ুপ্রবাহের শক্তি( আর সমুদ্রস্রোতের টানাপোড়েন বুঝে নাবিকেরা ভেসে পড়ত অকূল দরিয়ায়। ন( ত্র খচিত আকাশ আর সূর্যের পথপরিত্র(মা তাদের দিগ্‌দর্শনের একমাত্র ভরসা। আর পুঁজি ছিল পূর্বজদের সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা। দিক নির্ণয়ের যন্ত্র কম্পাস তখন কি এদেশে আবিষ্কৃত হয়েছিল? বোধ হয় নয়। এসব সত্ত্বেও প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ জলসমুদ্রে বিচরণ করতে শিখেছে। প্রথমে ডিঙায়-ভেলায় তারপর পাল-তোলা জাহাজে। নদীতে সমুদ্রে এবং তারপর মহাসমুদ্রে।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তেমনি এক বাণিজ্য তরণীতে চড়ে বসলেন। তাঁর সঙ্গে শতাধিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও যাত্রা করেছিল। তারাও ধর্মকীর্তির সন্নিধানে বোধিচিত্ত সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে দীপঙ্করের সঙ্গে গিয়েছিলেন? সঠিক কিনা জানা নেই। তবে তিব্বতী গ্রন্থে উল্লিখিত যে সুবর্ণদ্বীপের রাজা শ্রীমৎ ধর্মপাল 'শি( া-সমুত্তয়-অভিসময়-নাম' গ্রন্থের বক্ত(ব্য বিষয় দীপঙ্কর এবং কমল (কমলর( ত)-এর কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তা থেকে মনে হয়, কমলর( ত নামের আরেকজন শি( ার্থী তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

যদিও নির্দিষ্ট করে কোথাও বলা হয়নি, তবু অনুমান করা চলে যে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে সমুদ্রযাত্রার শুভারম্ভ হয়েছিল। বাংলা কিংবা উড়িষ্যার কোন না কোন বন্দর থেকেই তো সমুদ্রযাত্রা হওয়ার কথা। প্রাচীনকাল থেকে বন্দর হিসেবে প্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত। সুতরাং সেখানে সমুদ্রযাত্রার সম্ভাবনাই বেশি।

বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে পূর্বদিশায় চট্টগ্রাম। দূরত্ব ৩৫০ মাইল। দ( ণ দিকে আকিয়াব-আরাকান উপকূল হয়ে ইরাবতী নদীর সঙ্গম পেরিয়ে মার্তাবান উপসাগরে পৌঁছে যাত্রাবিরতি করা যায় রেঙ্গুনে। সোজাসুজি দূরত্ব হচ্ছে ৭৮০ মাইল। আরো দ( ণে শ্যামদেশ ছাড়িয়ে মালয়ের পশ্চিম উপকূলে পেনাং। একটু পরেই জাহাজ মালাক্কা প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করবে। সিঙ্গাপুর ঘুরে জলপথ অগ্রসর হয়েছে সুমাত্রা-জাভার দ্বীপরাজ্যে। পালেমবাং সুমাত্রার দ( ণাঞ্চলে অবস্থিত। সাগরসঙ্গম থেকে ভিতরের নদী-বন্দরে।

তাম্রলিপ্ত থেকে দ( ণ-পূর্ব দিশায় সোজাসুজি বঙ্গোপসাগরের জলরাশি ডিঙিয়ে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বাঁহাতে রেখে ৭৭০ মাইল অগ্রসর হয়ে রেঙ্গুন শহরে পৌঁছোনো যায়। বাষ্পচালিত জাহাজ তা সহজে পারে। পালতোলা জাহাজের প( দীর্ঘ সমুদ্রপথ পাড়ি দেওয়া শক্ত(।

আমরা জানি না দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে নিয়ে প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে বাণিজ্যতরণী কোনদিকে ভেসেছিল? কোন কোন বন্দরে নোঙর ফেলেছিল? সোজাসুজি রেঙ্গুনের দিকে যাত্রা করেছিল নাকি চট্টগ্রাম-পেনাং হয়ে অগ্রসর হয়েছিল? এ সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। শুধু জানা গিয়েছে সমুদ্রপথে আবহাওয়া বড়োই অশান্ত হয়ে উঠেছিল। প্রবল ঝঞ্ঝায় পথভ্রষ্ট হয়ে তরণী বিপথচালিত হয়ে অজ্ঞাত দেশে পৌঁছেছিল। এতই প্রবল ছিল ঝড়ের বেগ ও অশান্ত সমুদ্রের ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস যে যাত্রীদের প্রাণসংশয় হওয়ার উপত্র(ম



হয়েছিল। বিশাল পারাবারে তখন অবলোকিতে(রই ছিলেন একমাত্র ভরসা। কোন অজানা দ্বীপে তরণী ভিড়েছিল ছিন্নমূল হয়ে আমরা জানি না। কিংবা জানা-অজানা কোন-না-কোন দ্বীপের হদিশ পেতেই অনেকদিন ভেসে বেড়াতে হয়েছিল। তারপর কিভাবে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ঘুরে দেশ থেকে দেশান্তরে ভেসে ভেসে সুবর্ণদ্বীপে পৌঁছলেন কে জানে! শুধু জানি চৌদ্দমাস ধরে সমুদ্রযাত্রা করে অবশেষে সুবর্ণদ্বীপে উপস্থিত হতে পারলেন। চৌদ্দটা মাস অনেকটা সময়। এত দীর্ঘ জলপথে যাত্রা করা, অজানা দেশে অজানা বন্দরে নোঙর করা, অত্যন্ত কঠিন ও প্রাণান্তকর ছিল অনুমান করা যায়।

অথচ ফাহিয়েন তাম্রলিপ্ত থেকে ৭০০ যোজন দূরের সিংহলে পৌঁছেছিলেন চৌদ্দ দিনের জলপথ অতিত্র(ম করে। সেখান থেকে যবদ্বীপ যাত্রাকালে তিনিও সামুদ্রিক ঝড়ে পড়েছিলেন। তেরো দিন ধরে সেই ভীষণ ঝড় চলেছিল। তারপর নব্বুই দিন লেগেছিল সিংহল থেকে যবদ্বীপ পৌঁছতে। ভারত মহাসাগর অতিত্র(ম করে। তাহলে তাম্রলিপ্ত-সিংহল-যবদ্বীপ যদি একশ' চারদিনে অতিত্র(ম করা হয়ে থাকে, তবে দীপঙ্করের সমুদ্রযাত্রায় চার গুণ সময় লাগার নিশ্চয়ই গূঢ় কারণ ছিল যা আমাদের অজ্ঞাত।

দীপঙ্কর যখন সুবর্ণদ্বীপে অবতরণ করলেন, তখন রাজা শ্রীমারবিজয়োত্তুঙ্গা শ্রীবিজয়ের রাজাসনে।

দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পরে বিশ্রাম অত্যাবশ্যক। আরো আবশ্যক আচার্য ধর্মকীর্তির খোঁজখবর করা। সন্ধান পেলেও সোজাসুজি আচার্যের কাছে গেলেন না। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তারপর বিশ্রাম নিতে পারতেন। তা করলেন না। সাময়িক আশ্রয় জোগাড় করে আচার্য সম্পর্কে আরো খোঁজখবর করতে লাগলেন। তাঁরই শিষ্যদের কাছ থেকে। তিনি কেমন মানুষ, কি কি ভালোবাসেন, স্বভাবচরিত্র কেমন, প্রকৃতি কেমন ইত্যাদি জানার চেষ্টা করছিলেন দু' সপ্তাহ ধরে।

এদিকে আচার্যের নিকট তাঁর সুবর্ণদ্বীপে আগমন সংবাদ পৌঁছে গিয়েছে। তিনি জেনে গিয়েছেন — ভারত থেকে এসেছেন একজন পণ্ডিত বৌদ্ধ। তাঁর সঙ্গে আরো অনেক ভি( ও আছে। তাঁরা আচার্য ধর্মকীর্তির জীবনকথা জানতে উৎসুক।

আচার্য শিষ্যদের বলে রাখলেন — পুণ্যভূমি থেকে বিদেশী অতিথি এসেছেন। তিনি এলে সকলে মিলে সাদর সম্ভাষণ জানাতে হবে। প্রস্তুত থেকো।

দু' সপ্তাহ পরে (নাকি আরো অনেক পরে?) অতীশ দীপঙ্কর দর্শন করতে গেলেন বিহারের অধ্য( আচার্য ধর্মকীর্তির সঙ্গে। সেদিন বিহারবাসী সকলে সমবেত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। নানাবিধ শুভ মঙ্গলময় কর্ম সাধনা করল। আচার্যের চরণে প্রণতি জানিয়ে দীপঙ্কর সবিনয়ে নিবেদন করলেন তাঁর মনোবাসনার কথা। তিনি গুরুর কৃপা প্রার্থনা করছেন। বিশেষ করে বোধিচিত্ত চর্চা করতেই দূরদেশ থেকে এসেছেন।

সানন্দে সম্মতি জানালেন আচার্যদেব। তারপর বললেন — হ্যাঁ বোধিচিত্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ চর্চার ব্যাপার। নিজের মনকে সুনিয়ন্ত্রণে রাখতে অবশ্যই তা জানতে হবে। ভেবো না যে তা দুএকদিনে অর্জন করা সম্ভব। দীর্ঘ সময় লাগবে তার জন্য। সেজন্যে এখানে বাস করতে হবে। যতদিনে না শি(া সম্পূর্ণ হয় ততদিনের জন্য।

— আমি তার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

অতিথিকে আচার্য সুন্দর বুদ্ধমূর্তি উপহার দিলেন। তারপর বললেন — বৎস, একদিন তুমি উত্তর দিকের তুষার-দেশের মানুষেরও মন জয় করবে।

দীপঙ্কর তাঁর কাছে মহাযান মতের দার্শনিক তত্ত্ব নতুন করে নতুন ভাবে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল বোধিচিত্ত চর্চায়। গুরুর নিকট লাভ করলেন করুণা, মৈত্রী ও বোধিচিত্ত সম্পর্কে উপদেশামৃত। এবং অনেক গুপ্ত জ্ঞান। অধ্যয়ন করতে শুরু করলেন 'অভিসামান্য-অলঙ্কার' যা আসলে 'পারমিতা সূত্র' অনুধাবনে মৈত্রেয় কর্তৃক রচিত নির্দেশাবলীর সঙ্কলন। তারপর একে একে মৈত্রেয় এবং অসঙ্গ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যা যা লাভ করা গিয়েছে, সার্বিক আচার-আচরণবিধি সম্পর্কে জানা গিয়েছে, সেসব আয়ত্ত করা হল। বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর নিকট প্রত্য( ভাবে বোধিসত্ত্ব শান্তিদেব লাভ করেছিলেন স্বার্থসর্বস্বতার বিনিময়ে পরার্থপরতা কিভাবে তা অর্জন করা যায় তার পদ্ধতি। দীপঙ্কর সেই জ্ঞান আহরণ করলেন।

লামা সেরিলিংপার মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে দীপঙ্কর রচনা করেছিলেন দীর্ঘ ৫৮৭ পংক্তি(র 'বোধিসত্ত্ব-চর্যাবতার-ভাষ্য'। পূর্বে (সপ্তম শতকে) আচার্য শান্তিদেব তৃতীয় শতকের মৈত্রেয়নাথের যে ব্যাখ্যা বিধৃত করেছিলেন, তারই উত্তরাধিকার বর্তায় সুবর্ণদ্বীপের ধর্মপাল বা ধর্মকীর্তির হাতে।

সুমাত্রা অনতিদূরে আরেক দ্বীপ জাভা। অন্য নাম যবদ্বীপ। বঙ্গভাষীরা চেনেন তাকে কবিগুরুর 'সাগরিকা' থেকে — 'সাগর জলে সিনান করি সজল এলো চুলে / বসিয়া ছিলে উপল-উপকূলে।' জাভার বিস্ময়কর সৃষ্টি বোরোবুদুর। নির্মাণ শুরু করেছিলেন শ্রীবিজয়ের রাজা ধর্মসেতু। ৮২৫ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ সম্পূর্ণ করেন পরবর্তী রাজা সমরতুঙ্গা (৭৯২-৮৩৫ খৃঃ)। জাভার আরেক দর্শনীয় স্থান প্রম্বানানের শৈব মন্দির — লারা জোংরাং। জাভাতে তখন উদয়নের পুত্র এয়ারলিংগা (১০১০-১০৪৯ খৃঃ) মাতারাম রাজ্যের শাসক। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সেসব দর্শন করেছিলেন নিশ্চয়ই। তিনি কম্বুজ-বার্মার তীর্থস্থান সকল দর্শন করেছিলেন? জানা নেই।

নগোয়াং নিমা ও লামা চিমপা জানিয়েছেন — একবার গুরু ধর্মকীর্তির পাদবন্দনায় শ্রদ্ধা নিবেদন করার বাসনা হয়েছিল শিষ্য দীপঙ্করের। স্থানীয় সওদাগরদের সঙ্গে সমুদ্রে গিয়েছিলেন কোন দ্বীপ থেকে কিছু মূল্যবান রত্নাদি সংগ্রহ করে আনবেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে। পথে ঝড় উঠেছিল। জাহাজ দিশা হারিয়ে অজ্ঞাত দ্বীপে গিয়ে পৌঁছলো। সেখানে



দেখলেন — জল থেকে উত্থিত বিশালাকার সমুদ্রদানব বিরাট তিমিকে গিলে ফেলছে। ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে সকলে ভীত হয়ে পড়ল। একমাত্র দীপঙ্কর ভয়লেশহীন। তিনি জানেন জ্ঞান সহজে আসে না। তার জন্য সাহসী হতে হয় এবং বিপদের মোকাবিলা করতে হয়।

শি(াদী(ায় কয়েকটা বৎসর গত হল। হঠাৎ সুবর্ণভূমির রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে প্রবল দুর্যোগ ঘনীভূত হল। রাজ্যে শান্তি বুঝি আর থাকে না। যুদ্ধ হলে দেশের মানুষের আর শান্তি কোথায় থাকে! ইতিহাস বলে একাদশ শতকে দ(িণ ভারতের চোল সাম্রাজ্যের সঙ্গে সুমাত্রার শৈলেন্দ্র রাজ্য দীর্ঘ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। চোল রাজবংশের রাজা রাজেন্দ্রচোল সুবর্ণদ্বীপ আত্র(মণ করেন। সময়কাল ১০২৫ খৃষ্টাব্দ। তখন শৈলেন্দ্র রাজা ছিলেন সুমাত্রাভূমি যিনি আট বৎসর হল সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। শৈলেন্দ্র রাজ্য পরাত্র(ান্ত চোলরাজার আত্র(মণ প্রতিরোধ করতে পারেন নি। নৌযুদ্ধে পরাস্ত হলেন। পেগু (?) হাতছাড়া হয়ে গেল। পেগুর সুধর্মনগর বর্তমানকালের থাটোন। সুমাত্রা-মালয়ের কিয়দংশ চোল শাসনের অন্তর্ভুক্ত( হল। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও চোল শাসন বহাল হল। সুবর্ণদ্বীপ রাজ্যে নেমেছে মহা দুর্যোগ। এমন বিপর্যস্ত রাজনৈতিক অবস্থার কারণে দীপঙ্কর দেশে ফেরার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। ইতিমধ্যে বারোটি বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। বোধিচিত্ত চর্চায় প্রার্থিত সাফল্য লাভ হয়েছে। সুতরাং দেশে ফেরা যায়। দেশের জন্য মনও টেনেছিল কি? মাটির টান তো থাকতেই পারে। তাকে উপে(া করার সাধ্য কার!

একদিন সুযোগ এসে গেল। সুবর্ণদ্বীপ থেকে খানকয়েক বাণিজ্য তরণী শ্রীলঙ্কা যাত্রা করবে। সেই জাহাজে চেপে তিনি ভেসে চললেন পশ্চিমে শ্রীলঙ্কার দিকে। বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে যাত্রাপথ। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পাশে রেখে। তাম্রদ্বীপ বা তাম্রলিপি নামে পরিচিত ছিল শ্রীলঙ্কা। অনেককাল আগে সম্রাট অশোক (২৭২-২৪৩ খৃঃপূঃ) থের মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে পাঠিয়েছিলেন তাম্রদ্বীপে বৌদ্ধধর্মপ্রচারে। সঙ্গে ছিল পবিত্র বোধিবৃ(ের শাখা। অনুরাধাপুরের মহামেঘবনে সেই পবিত্র চারা রোপন করা হয়েছিল।

প্রায় সাড়ে ছয়শত বৎসর পরে চিনা পর্যটক ফাহিয়েন (জন্ম ৩৩১খৃঃ) সিংহলে এসে দেখে গিয়েছেন সেই চারা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বৃ( তলে বিহার নির্মিত রয়েছে। সিংহলের সেই প্রথম বিহার 'মহামেঘবন বিহার' কালে 'মহাবিহার' নামে পরিচিত হয়। দেখেছিলেন (শ্রীপাদ বা অ্যাডামস পিক) পর্বতশীর্ষে বুদ্ধের পদচিহ্( এবং তাকে আশ্রয় করে নির্মিত চারশ' ফুট উঁচু স্তূপ। তিনি প্রথম শতকের বট্টগামিনী অভয় কর্তৃক নির্মিত 'অভয়গিরি বিহার'-এ অবস্থান করেছিলেন। তখন সিংহলের রাজা ছিলেন বুদ্ধদাস। সে সময় বিহারে সহস্র ভি( বাস করতেন। ধম্মচক্ক মন্দিরে সংর(িত ছিল বুদ্ধের দন্তাবশেষ (বর্তমানে ক্যাণ্ডির ডালাড মালিগাওয়া মন্দিরে)। থুপারাম ডাগোবা নির্মাণ করেছিলেন দেবানমপিয় তিষ্য (২৪৭-২০৭ খৃঃপূঃ)। সেখানে বুদ্ধের ভি(াপাত্র আরেক পবিত্র দ্রষ্টব্য। অনুরাধাপুরে নির্মিত জেতবনারাম ডাগোবা — আড়াইশ' ফুট উঁচু, প্রাচীরবেষ্টিত

বিশাল এলাকায় অবস্থিত। অদূরে তোলুভিলা (অয়ুকুনা?)-তে বিশাল বুদ্ধমূর্তি আছে। গড়েছেন রাজা মহাসেন (৩৩৪-৩৬২ খৃঃ)। সামান্য দূরে মিহিনতালের গুহা। অশোক প্রেরিত মহেন্দ্রর সঙ্গে সিংহলের রাজার সা( াত হয়েছিল সেখানে। সিগিরিয়া পাহাড়ে রাজা কাশ্যপ (৪৭৫-৫০০ খৃঃ) দুর্গ নির্মাণ করে অজন্তার অনুসরণে প্রস্তরশীলায় আঁকিয়েছেন সুন্দর ফ্রেস্কো চিত্র। সপ্তম শতকে চিনা পর্যটক ইৎসিং অভয়গিরি বিহারে পাঁচ হাজার ও মহাবিহারে তিন হাজার ভি( ুকে বসবাস করতে দেখেছিলেন।

ফাহিয়েনের মতো দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানও নিশ্চয়ই দর্শন করেছিলেন বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি। দুঃসাহসী বঙ্গসন্তান যিনি সুবর্ণদ্বীপের বিহারে জ্ঞানের সন্ধানে বেরিয়ে বারোটা বৎসর কাটিয়ে দিতে পারেন, তিনি বৌদ্ধ তীর্থদর্শন এড়িয়ে যেতে পারেন না। তবে সিংহলে তখন প্রবল রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল। ভি( ুসংঘে বিশৃংখলা চলছিল।

কথিত আছে, সিংহল থেকে ফেরার পথে অরণ্যসঙ্কুল দ্বীপদেশ ঘুরে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। তবে কোন অরণ্যবহুল দ্বীপের কথা বলা হয়েছে, তা অজ্ঞাত। একমাত্র জারোয়া-অধ্যুষিত আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান সিংহল-তাম্রলিপ্ত সমুদ্রপথের মধ্যপথে। তার কথা বলা হয়নি তো?

সুবর্ণভূমি থেকে দীপঙ্কর বঙ্গদেশে যখন ফিরলেন তখন তাঁর বয়স হয়েছে তেতাল্লিশ বৎসর। সময়কাল ১০২৫ খৃষ্টাব্দ।

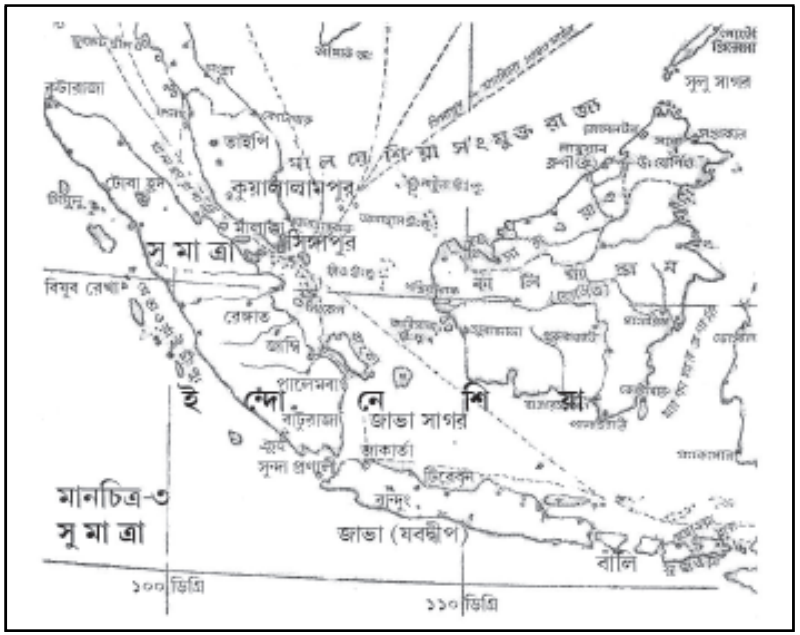




## ৭। অধ্য( দীপঙ্কর

(১০২৫-১০৪০ খৃঃ)

স্বদেশভূমিতে ফিরে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রথমে গেলেন বুদ্ধগয়ার বজ্রাসনে। তথাগত বুদ্ধের চরণে প্রণাম জানাতে। সেখানে মহাবোধি বিহারে কিছুকাল বাস করলেন। অনেক পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে চর্চা করলেন। তর্কবিতর্ক হল। অবসরকালে সাধারণ মানুষজনকে ধর্মোপদেশ দান করে কর্তব্য সম্পাদন করতে লাগলেন।

এসময় তাঁর সঙ্গে সা( াত হয়েছিল আচার্য শান্তি, নরোপান্ত, কুশল, অবধূতি, তোম্বি এবং আরো অনেকে পণ্ডিতের। বলা হয় যে ঐ সময়ে তিনি তিন তিনবার তীর্থিকদের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করে বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন। এসবের ফলে সমগ্র মগধ জুড়ে তাঁর সুনাম আরো বিস্তৃত হয়ে পড়ল।

মগধের সিংহাসনে তখন পাল বংশের রাজা মহীপাল-১ অথবা নয়পাল অধিষ্ঠিত। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় নয়পালের রাজত্বকাল ১০২৫ থেকে ১০৪৫ খৃষ্টাব্দ ধার্য করেছেন। অনেকের মতে ১০১৩ খৃষ্টাব্দে রাজা নয়পালের রাজত্বকাল শুরু হয়। 'গৌড়ের ইতিহাস' গ্রন্থে নয়পালদেবের রাজত্বকাল ১০৩৬-১০৫৩ খৃষ্টাব্দ ধরা হয়েছে। স্মিথের মতে ১০৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা নয়পাল সিংহাসনে বসেন। রাজত্বকাল শেষ হয় ১০৩৮ খৃষ্টাব্দের পরে। সঠিক কালনির্ণয় এখনো অধরা। গবেষিকা অলকা চট্টোপাধ্যায় নয়পালের সিংহাসনারোহণ ১০৩৮ সালে বলেছেন কেননা অল্পকাল পরে অতীশের তিব্বত-যাত্রা। যদি তাই হয়, তবে দীপঙ্করের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল মগধের রাজা মহীপালের আমলে।

সুবর্ণভূমি থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে পালবংশের রাজা, সম্ভবত মহীপালদেব, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বিত্র(মশীল মহাবিহারে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান রাজার অনুরোধত্র(মে বিত্র(মশীল বিহারের সঙ্গে যুক্ত( হলেন।

শরৎ চন্দ্র দাস বলেছেন, রাজা নয়পালের অনুরোধে তিনি বিত্র(মশীলার উচ্চ পুরোহিত (হাই প্রিস্ট) পদ গ্রহণ করেছিলেন। বিত্র(মশীল বিহারে অধ্য( বা উচ্চ-পুরোহিত যে পদেই হোক না কেন, নিযুক্ত( হয়েছিলেন ঠিকই, তবে নিয়োগের অনুরোধ এসেছিল মহীপালদেবের তরফ থেকে না নয়পালের তরফ থেকে তা নিয়ে দ্বিমত থেকে গিয়েছে। কোন পদে তাঁর অধিষ্ঠান হয়েছিল তাও স্পষ্ট নয়।

অষ্টম শতকে পালবংশীয় রাজা ধর্মপাল দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল এই বিত্র(মশীল বিহার। সেখানে তখন প্রায় আট হাজার শি( ার্থী শি( ালাভ করত। একশত আট জন প্রখ্যাত পণ্ডিত শি( কতা করতেন। নালন্দার থেকে খ্যাতিতে বিত্র(মশীল তখন খাটো নয়।

নানা সূত্র থেকে জ্ঞাত হওয়া যাচ্ছে যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তখন প্রখ্যাত তিন বিহারের সঙ্গেই যুক্ত( ছিলেন। অনেকের মতে তিনি বিত্র(মশীল বিহারের উপাধ্যায় ছিলেন এবং একই সঙ্গে ওদন্তপুরী বিহারের প্রতিপালক।

মনে হয় তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল নিশ্চয়ই বিত্র(মশীল বিহার। সম্ভবত সেখানে তিনি সর্বোচ্চ পদে অর্থাৎ প্রধান আচার্য হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। তা না হলেও কোন উচ্চপদে আসীন ছিলেন। কেননা সংঘের শৃঙ্খলার( ার মতো গুরু দায়দায়িত্ব তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল।

সুমপা বলেছেন, তখন বিত্র(মশীল বিহারের প্রধান ছিলেন স্থবির রত্নাকর। আবার গোস লোসাব বলেছেন তখন বিত্র(মশীনের স্থবির ছিলেন শীলকর। দীপঙ্করের এক গুরুর নাম রত্নাকরশান্তি বা শান্তিপা। শীলকর ও রত্নাকর একই ব্যক্তি( কিনা জানা যায়নি। তেমনি রত্নাকর ও রত্নাকরশান্তি একই কিনা অনিশ্চিত। তবে যিনিই হোন বা যে নামেই থাকুন, তাঁর বিহারে উচ্চাসন ছিল। আচার্য দীপঙ্কর ঐ জ্যেষ্ঠ প্রাজ্ঞের অধীনে কর্মরত ছিলেন। অবশ্য বিহারের প্রশাসনিক দায়ভার সব না হলেও কিছুটা তাঁকে পালন করতে হত। দুটি সূত্র থেকে দুটি ঘটনার উল্লেখ থেকে তেমনটাই জানা যায়।

প্রথম ঘটনাটি এরকম। সুমপা অনুসারে, বিত্র(মশীল বিহারে তখন সদ্য ছয় দ্বার-র( কের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আচার্য নারোপার সঙ্গে সা( াত করে বৌদ্ধধর্মে দী( াগ্রহণ করেন। আচার্য রত্নাকরশান্তির নিকট শি( ালাভ করে পণ্ডিত রূপে গণ্য হন। বিত্র(মশীল বিহারে তিনি সূত্র এবং তন্ত্র উভয়ই শি( ালাভ করতেন। ছাত্রাবস্থায় দুধকে মদ্যে পরিবর্তিত করে পান করতেন। দীপঙ্কর তখন বিহারের প্রশাসক (প্রোভোস্ট-সার্জেন্ট) পদে আসীন। তিনি ঐ ছাত্রকে বিহার থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ মৈত্রীগুপ্ত ও শভরে(র দুই নামে পরিচিত। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তিও যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল। শ্রীপর্বতে শবরীর ছায়া-শরীর প্রত্য( করে তিনি ফিরে এসেছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা শরৎ চন্দ্র দাস বর্ণিত আরেকটি কাহিনী। বিত্র(মশীল বিহারে কিংসুখা নামে কিছু তান্ত্রিক বাস করত। তাদের মধ্যে একজনের নাম মৈত্রী। মতাদর্শজনিত ও পালনীয় সংস্কার এবং আনুষঙ্গিক কিছু বিষয় নিয়ে বিহারের নিয়মভঙ্গের অভিযোগ উঠেছিল তার বিরুদ্ধে। তা নিয়ে শান্তি নামের এক সন্ন্যাসী বিহারের দেয়ালে আপত্তিজনক মন্তব্য লেখে। আরেকবার মৈত্রীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা মদ পাওয়া যায়। এক বৌদ্ধ যোগিনীর সঙ্গে তার কিছু কথাবার্তা বলার ছিল। ঐ মদ যোগিনীকে দেওয়ার জন্য। এমন কথাই বলেছিল সে। সংঘ এসমস্ত জেনে ভয়ানক অসন্তোষ প্রকাশ করে। মৈত্রীকে বিহার থেকে তাড়ানোই উচিত, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তান্ত্রিক মৈত্রী তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। এ নিয়ে সংঘের সভ্যদের মধ্যে গুরুতর মতবিরোধ উপস্থিত হল। শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সভ্য মৈত্রীর বহিষ্কার কার্যকর করার প( সম্মতি জানালো। গুরুতর



অপরাধের কারণে তাকে প্রধান দ্বারের পরিবর্তে প্রাচীরের পার্(দ্বার দিয়ে বহিষ্কৃত করার ব্যবস্থা করা হল। সঙ্ঘ-প্রধান দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অধিকাংশ সভ্যের মতে সম্মতি জানিয়েছিলেন। এবং কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে মৈত্রীর বহিষ্কার কার্যকর করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছিল — সত্যি কি মৈত্রী দোষী।

তন্ত্রমন্ত্রে দীপঙ্কর প্রভূত পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন এককালে। জীবনের অনেকটা সময় ব্যয় করেছিলেন তন্ত্রচর্চায়। বৌদ্ধদী( া গ্রহণের পরে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়েছে। তন্ত্রমন্ত্রের তুলনায় ভি( জীবনের প্রথানুগত আচার আচরণই শ্রেয় মনে করেন। তাই এই দ্বিধা? রাত্রে আরাধ্যা দেবীর কাছে প্রার্থনা জানালেন। স্বপ্নে দেবী তারা তাঁকে জানালেন — পুত্র কাজটা ভালো হয়নি।

নিদ্রাভঙ্গ হল। শয্যা থেকে ক( র বাইরে এসে দেখেন কোথাও কেউ নেই। আরো স্পষ্ট নির্দেশের জন্য দেবতা ও বোধিসত্ত্বের কাছে আবার প্রার্থনা নিবেদন করলেন। অল( ে এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন — মৈত্রী নির্দোষ কেননা সে বোধিজীবনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করেছিল( তার বহিষ্কার মঞ্জুর করে অপরাধ করেছো।

আরো জ্ঞাত হলেন যে এর জন্য তাঁকে সুমেরুর এক বিশাল পাখি হয়ে জন্মাতে হবে এবং অনেক প্রাণীহত্যা করতে হবে। তবে তা থেকে মুক্তি(র উপায়ও আছে। তা হল মহাযান ধর্ম প্রচার করতে উত্তরদিকে তথা তিব্বতে গমন।

পরে তিনি গুরু লামা গগপালের কাছে সদুপদেশ প্রার্থনা করেছিলেন। গুরু তাঁকে বলেন — যেহেতু সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বহিষ্কার করা হয়েছে তাই তাঁর কোন পাপ অর্শায় নি। আর যদি বা পাপ হয়েও থাকে, তবে পাপমুক্তি(র জন্য তাঁকে তিব্বতে যেতে হবে এবং সেখানকার রাজা, যিনি পূর্বজন্মে প্রত্যেক বুদ্ধকে অর্ধসের করে অন্নদান করেছিলেন, তাঁর আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা হতে হবে। তাহলেই পাপস্খালন হয়ে যাবে।

বিত্র(মশীলের প্রধান আচার্য হিসেবে দীপঙ্করের যোগদানের পরে বিহারের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। ভি( দের জন্য বৃহত্তর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হল। শি( াদী( ার জন্য নতুন পাঠত্র(ম চালু করা হল। তাঁর আকর্ষণে আরো নতুন শি( ার্থীর সমাগম হতে লাগল। পঠনপাঠনের ধারাও পরিবর্তিত হল। বিহারের প্রবেশদ্বারে দুটি দৃষ্টি আকর্ষণকারী মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। নির্মাণ করেছিল বিহারের ছাত্রমণ্ডলী। একটি মূর্তি ছিল আচার্য নাগার্জুনের অন্যটি দীপঙ্করের। দ্বারের দুপাশে মূর্তিদ্বয় দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখা হয়েছিল।

দীপঙ্কর দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় আচারাদি তিনি অতি নিষ্ঠাভরে পালন করতেন। কখনো ভুল হত না। অন্য ভি( রা ত্রিসম্বর পালন নিয়ে গর্ব অনুভব করত( যেমন করে ইয়াক সুন্দর লেজ ও কেশর নিয়ে গর্বিত থাকে তেমনি করে। আর বারংবার ভুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে ও আত্মশোধন করে। দীপঙ্করকে কখনো বারবার করে আত্মশোধন করতে

হয়নি। শুধু তাই নয়। ধর্মর( ার জন্য সাধারণত চার প্রকার শক্তি( র অপর নির্ভর করতে হয়। যোগ শক্তি(, ঐশ্বর্য শক্তি(, কুল-শক্তি( ও বিদ্যাশক্তি(। এর যে কোন একটি দ্বারা ধর্ম র( িত হতে পারে। মহামান্য দীপঙ্করের চার প্রকার শক্তি(ই বর্তমান ছিল। তাই যেন বৌদ্ধধর্ম র( ার পবিত্র দায় ত্র(মশ এসে পড়ছিল তাঁরই উপর।

পাল রাজত্বকালে ওদন্তপুরী ও সোমপুরী বিহারও বিদ্যাচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। দুটি বিহারের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কখনো ধর্মপাল ও কখনো দেবপালের নাম উল্লিখিত হয়। রজনী কান্ত চত্র(বর্তী বলেছেন — ওদন্তপুরী বিহার ছিল সম্ভবত রাজগীরের বিহারশরিফের কাছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে নির্মিত। বিহারে বিশাল পুস্তকাগার স্থাপিত হয়েছিল। রাজা মহীপালের সময় এখানে হীনযান মতের এক হাজার ও মহাযান মতের পাঁচ হাজার ভি( বাস করত। তারানাথের মতে অবশ্য এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপাল-১। তিব্বতী গ্রন্থ পাগ-সাম-জোম-জ্যাং অনুসারে তাঁকে নালন্দা বিহারের প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়েছে। তবে এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। বুতোনের বর্ণনা অনুসারে ধর্মপাল একটি বিহার নির্মাণ করেছিলেন এবং সেটি ওদন্তপুরী বিহার।

ধর্মপালের জন্মকাহিনী ও ওদন্তপুরী বিহার তৈরী নিয়ে প্রবাদ প্রচলিত আছে। রাজা গোপালের রানি রাজাকে বশীভূত রাখার জন্য জনৈক ব্রাহ্মণকে অলৌকিক ( মতা লাভের উপায় করতে বলেন। ঐ ব্রাহ্মণ হিমালয় থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ঔষধ তৈরী করে দাসীর মারফত রানির কাছে পাঠিয়ে দেয়। দুর্ভাগ্যত্র(মে নদী অতিত্র(মের সময় ঔষধ জলে পড়ে যায়। নাগরাজা ঔষধটি গলাধঃকরণ করে ফেলে। ঔষধের ত্রি(য়ার নাগরাজার রানি গর্ভবতী হয় এবং যথাকালে শ্রীমদ ধর্মপালের জন্ম হয়।

আরো জানা যায় — বয়ঃপ্রাপ্ত হলে রাজা ধর্মপাল একটি অনিন্দ্যসুন্দর মন্দির নির্মাণ করতে বাসনা করেন। এজন্য জনৈক জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হলেন। জ্যোতিষী তাঁকে বললেন — সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণের তুলা থেকে পলতে, রাজা ও বণিকের ঘর থেকে তৈল, কৃচ্ছসাধকের কাছ থেকে প্রদীপ সংগ্রহ করতে। তারপর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সামনে সেই প্রদীপ জ্বালাতে হবে এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে হবে। র( ক-দেবতা সেই প্রদীপখানি দূরে নি( প করবেন। যেখানে প্রদীপ পড়বে, সেখানে মন্দির নির্মাণ করা যাবে।

জ্যোতিষীর কথামতো তাই করা হল। কোথা থেকে এক দাঁড়কাক উড়ে এসে প্রদীপখানি হ্রদের জলে নি( প করল। রাজা দুঃখিত মনে ঘরে ফিরলেন। হ্রদের মধ্যে মন্দির নির্মাণ করা সম্ভব নয়। সেরাতে পঞ্চ-ফণাধারী নাগরাজা স্বপ্নে দেখা দিয়ে রাজাকে বললেন — আমি তোমার পিতা, চিন্তা কোরো না। আমি হ্রদ শুকিয়ে দেবো। তারপর সেখানে মন্দির নির্মাণ কোরো। এজন্যে কেবল সাত সপ্তাহ ধরে বলি চড়াতে হবে।

স্বপ্নাদেশ অনুসারে তেমনটাই করা হল। হ্রদের জল ত্র(মে শুকিয়ে গেলে তারপর সেখানে ওদন্তপুরী বিহার নির্মিত হল।



তারানাথ ওদন্তপুরী নিয়ে যে কাহিনীর কথা শুনিয়েছেন তা এই রকম।

মগধের নিকটবর্তী অঞ্চলে নারদ নামের তীর্থিক যোগী অলৌকিক ( মতার অধিকারী ছিলেন। শবসাধনা করতে বসে উপযুক্ত( সাহায্যকারী হিসেবে জুটেছিল এক বৌদ্ধ উপাসক। বৌদ্ধ হলেও গুরুর অনুমতিত্র(মে তিনি নারদকে সাধনায় সাহায্য করতে রাজি হলেন।

নারদ তাকে বললেন — আমি শবসাধনা করতে বসবো। শব থেকে যখন জিভ বেরিয়ে আসবে, তখন হাতে টেনে ধরতে হবে। একবারেই জিভ ঠিকমতো টেনে ধরতে পারলে মহাসিদ্ধি লাভ হবে। বৌদ্ধ উপাসক দু'বার ব্যর্থ হওয়ার পরে তৃতীয়বারে সফল হলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, শবের জিভ হয়ে গেল তরবারী আর দেহ স্বর্ণময় হয়ে গেল। উপাসক সেই দৈব তরবারী নিয়ে আকাশমার্গে বিচরণ করতে করতে সুমেরু ভ্রমণ করে এলেন। পরে 'বেতাল' নারদ তরবারী নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। আর স্বর্ণদেহ নিয়ে উন্ন উপাসক ওদন্তপুরী বিহার নির্মাণ করলেন সুমেরু ও সংলগ্ন চার দ্বীপের আদলে।

প্রায় একই রকমের কাহিনী শুনি তারানাথ কিংবা সুমপার কাছে। দেবপালের জন্ম এবং তাঁর সোমপুরী বিহার নির্মাণ নিয়ে। রাজা গোপালের কনিষ্ঠা রানিকে নিয়ে গল্প। নাগরাজার নাম ছিল সাগরপাল। গোপালের পরে রাজা হয়েছিলেন দেবপাল।

সোমপুরী বিহারের অবস্থান বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে। নির্মাতা পাল-নৃপতি ধর্মপাল কেননা সেখানে যে মৃৎফলক পাওয়া গিয়েছে তাতে লিখিত আছে 'শ্রী-সোমপুরে-শ্রী-ধর্মপালদেব-মহাবিহারীয়র্য্য-ভি(-সংঘস্য'। তারানাথের নিবেদন, বরেন্দ্রজয়ের পরে রাজা দেবপাল এই বিহার নির্মাণ করেন। সম্ভবত ধর্মপালের আরব্ধ কর্ম সম্পন্ন করেছিলেন তিনি।

পরবর্তী রাজা মহেন্দ্রপালের পঞ্চম বর্ষীয় রাজত্বকালে পাহাড়পুর স্তম্ভলেখতে ভি( অজয়গর্ভের নাম উল্লিখিত আছে। তা থেকে অনুমান রাজা মহেন্দ্রপালের সময়ও ঐ বিহার রাজানুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। প্রথম মহীপালের সময় বিহারের সংস্কারকার্য হয় এবং সেসময় পালরাজা সোমপুর বিহারে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়েছিলেন।

নালন্দায় প্রাপ্ত বিপুলশ্রীমিত্র-লেখ থেকে জানা যায়, তাঁর পূর্বপুরুষ করুণাশ্রীমিত্র সোমপুর-বিহারের অগ্নিদাহে মারা যান কেননা তিনি বিহার ত্যাগ করতে অস্বীকার করেছিলেন। সম্ভবত বঙ্গদেশের বর্মন শাসকদের আত্র(মণের জেরে বিহারে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। এক শতক পরে বিপুলশ্রীমিত্র সোমপুর বিহারে সংস্কারাদি করেন ও একটি তারাদেবীর মন্দির নির্মাণ করেন।

অনেক তিব্বতী ভি( ঐ সোমপুর বিহারে বসবাস করেছেন। অতীশ দীপঙ্কর কয়েক বৎসর ঐ বিহারে বাস করেন। পঞ্চম শতকের আচার্য মহাপণ্ডিত ভাব্য (ভাববিবেক) রচিত 'মাধ্যমক-রত্নপ্রদীপ-নাম' গ্রন্থটি সেসময় তিনি তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। দুই তিব্বতী ভি( বীর্যসিংহ ও জয়শীল তখন অনুবাদকর্মে সাহায্য করেছিলেন। ধর্মগুরু

রত্নাকরশান্তি তখন বোধহয় বিহারের স্থবির ছিলেন। মহাপণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র সোমপুর বিহারের আবাসিক ভি(ু। কলমহাপাদ, বীরেন্দ্র, করুণাশ্রীমিত্র ইত্যাদি পণ্ডিতগণও বিহারের সঙ্গে কোন না কোন সময়ে যুক্ত( ছিলেন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নানা বিহারে ঘুরে ঘুরে অধ্য( দীপঙ্কর ধর্মদেশনা করে চলেছেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে। নালন্দা, বিত্র(মশীল, ওদন্তপুরী আর সোমপুরী বিহারে। ধর্মপ্রচারে ও শি( াদানে তাঁর কর্মধারাকে সম্মান জানাতে তাঁকে 'ধম্মপাল' নামে অভিহিত করা হল।

বিত্র(মশীল বিহারে অবস্থানকালে তিনি নানা শাস্ত্র রচনায় মগ্ন হয়েছিলেন। রচনা করলেন 'কায়-বাক-চিত্ত-সুপ্রতিষ্ঠা-নাম'। পরে তিব্বতী লোসাব বীর্যসিংহের সঙ্গে সেখানে বসেই তার তিব্বতী ভাষ্য অনুবাদ করলেন। তিব্বতী গ্রন্থের এক সংস্করণে তাঁকে তখন উপাধ্যায় সম্বোধন করা হয়েছে।

আরেক তিব্বতী ছাত্র শাক্যভি(ু জয়শীলের অনুরোধে বিত্র(মশীল বিহারে বসে লিখলেন 'রত্ন-করণ্ড-উদ্‌ঘাত-নাম-মাধ্যমক-উপদেশ'। পরিচিতিতে রাজা দেবপালের সঙ্গে ঐ বিহারের নাম জড়িয়ে রয়েছে। কেন তা দুর্বোধ্য। পরিচিতিতে আরো বলা হয়েছে — যারা নিষ্ঠাভরে শীল পালন করেন না এই শাস্ত্র কখনো তাদের জন্য নয়( যে ব্যক্তি( আর্য নাগার্জুনের শাস্ত্রে ঐকান্তিক নয়, তার যেন নরকে ঠাঁই হয়( মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এতদ্বারা শাস্ত্রটি রচনা করেছেন। তার তিব্বতী অনুবাদও হল বিত্র(মশীল বিহারে বসে। অনুবাদ কর্মে সাহায্য করেছেন মহা-উপাসক বীর্যসিংহ এবং ভি(ু জয়শীল।

বিত্র(মশীল বিহারে বসে দীপঙ্কর আরো শাস্ত্র রচনা করেন। যেমন 'সংসার-মনোনির্যাণী-কার-নাম-সঙ্গীতি'। গুরুর নির্দেশানুসারে তার অনুবাদ করেন বীর্যসিংহ।

তারা-পঞ্চ-বিদ্যা সম্পর্কে যারা সুপরিচিত নন তাদের জন্য মহা-আচার্য চন্দ্রগোমিন রচনা করেছিলেন 'আর্য-তারা-দেবী-স্তোত্র-মুক্তি(কা-মালা-নাম'। বিত্র(মশীল বিহারে বসে জয়শীলকে নিয়ে ঐ শাস্ত্রের অনুবাদ করলেন।

শ্রীজ্ঞানের অন্যতম দীর্ঘ রচনা 'মহা-সূত্র-সমুচ্চয়-নাম' নামক গ্রন্থটি ছিল ৩৬৬৫ পংক্তি(র। জীবধারি নামের ভি(ু লিপিবদ্ধ করেছেন। তিব্বতী হরফে রূপান্তরিত করেছেন শাক্য-স্থবির গুণকীর্তি (ইয়োন-তোন-গ্রাগস-পা)। পরে শাস্ত্রগ্রন্থটি সংস্কৃত হয়েছে সূর্যকীর্তি (নি-মা-তোন-গ্রাগস-পা) ও কা(্মীরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জয়ানন্দ দ্বারা।

পশ্চিমদিকে কলচুরির রাজা ছিলেন (চেদিরাজ) কর্ণ। ঐ কার্ণ্যরাজা সম্ভবত কনৌজের রাজাও ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পালরাজাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হল। আসলে দীর্ঘকাল ধরে কর্ণের পিতা রাজা গাঙ্গেয়দেব ও গৌড় বংশের রাজা মহীপালের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক ছিল। তারই জেরে কলচুরিরাজ কর্ণ মগধরাজ্য আত্র(মণ করে বসেন। রাজা কর্ণ হয়তো পিতা গাঙ্গেয়দেবের মৃত্যুর পরে ১০৪১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কেউ বলেন



১০৩৯ খৃষ্টাব্দে। কর্ণের রাজত্বকাল সুনিশ্চিত হয় নি। যুদ্ধে রাজা নয়পালের সেনাবল প্রাথমিক পর্যায়ে পরাস্ত হয়। শত্রুদল মগধ রাজধানী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। শোনা যায়, কার্ণ্যরাজের সেনাদল তখন অনেক বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করে ব্যাপক লুণ্ঠন চালায়। পাঁচ জন অহিংস বৌদ্ধকে পর্যন্ত তারা হত্যা করে। ঐ পাঁচজনের মধ্যে চারজন সন্ন্যাসী ও একজন উপাসক। মঠ থেকে প্রচুর আসবাবপত্র লুটপাট করে নিয়ে যায়।

মঠের অন্যতম প্রধান অতীশ তা দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন না। ত্রে(াধ পর্যন্ত প্রদর্শন করলেন না। শান্ত মনে বোধিচিত্তের ধ্যান করতে লাগলেন।

যুদ্ধের অন্তিম পর্যায়ে নয়পালের সেনাদল জয়লাভ করে। তারা তখন প্রতিশোধ নিতে শত্রুসেনাদের হত্যা করতে উদ্যত হয়। অহিংস দী( ায় দী( ত দীপঙ্কর শত্রুর জীবনর( ায় ব্রতী হলেন। রাজা কর্ণ ও তার সেনাদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দান করলেন। উপায়ান্তর না দেখে রাজা কর্ণ শত্রুপ( র নিকট শান্তির আবেদন জানালো। দুটি রাজ্যের মধ্যে বিরোধের অবসানকল্পে তখন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সবিশেষ উদ্যোগী হলেন। শান্তিস্থাপন করতে সন্ধির জন্য সচেষ্ট হলেন। সন্ধির অন্যতম শর্ত হল — নয়পালের পুত্র বিগ্রহপালের সঙ্গে কর্ণরাজার কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ হবে। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে তবেই দীর্ঘকালীন শত্রুতার অবসান ঘটবে।

এই ঘটনার পরে কার্ণ্যরাজ নাকি গভীর শ্রদ্ধায় দীপঙ্করের অনুগত ভক্তে( পরিণত হয়েছিলেন। পশ্চিমে তাঁর রাজ্যে দীপঙ্করকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। বিহার থেকে লুণ্ঠিত আসবাবপত্র যতটা সম্ভব হল ফিরিয়ে দিলেন। যা ফেরানো গেল না তার জন্য যথোপযুক্ত( (তিপূরণ দিলেন। এই যুদ্ধ ঠিক কবে সংঘটিত হয়েছিল তা কর্ণ ও নয়পালের রাজত্বকাল সুনিশ্চিত না হলে বলা মুস্কিল।

বিদ্যাচর্চা শি( াদান বিহার-পরিচালনা এই সব নিয়ে দেখতে দেখতে দীপঙ্করের পনেরো বৎসর কেটে গেল। তাঁর বয়স হয়ে গেল প্রায় আটান্ন বৎসর।

কোথায় সেই বজ্রযোগিনীর রাজপ্রাসাদ! মনে পড়ে? এক গুরু থেকে আরেক গুরু, তন্ত্রমন্ত্র, শি( া, দী( া, মঠ-বিহার, তারপর সুদূর সুমাত্রা — এসব করে জীবনের কতগুলো বৎসর কেটে গেল। তথাগত বুদ্ধকে স্মরণ করে। ধর্ম আশ্রয় করে। সংঘের অনুশাসন মেনে চলে।

এবার কি তবে ( ান্তি? অবসর?

## ৮। তিব্বতের কথা

অতীশ দীপঙ্কর যখন বিক্রমশীল বিহারে অবস্থান করছিলেন, তিব্বতের এক রাজ দরবার থেকে তাঁর কাছে নিমন্ত্রণ আসে। সেদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য। সমগ্র তিব্বত তখন অধার্মিকতার গভীর পাকে নিমজ্জিত। বিপন্ন দেশবাসীকে উদ্ধারের জন্য পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতের অত্যন্ত প্রয়োজন।

পশ্চিম তিব্বতের বৌদ্ধরাজা তখন লা-লামা (দেবগুরু) খোর-দে। দীর্ঘান্তে যার নাম হয়েছিল 'এ-শে-ওদ'। একথার অর্থ — 'জ্ঞানপ্রভ'। তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন ভারতীয় পণ্ডিতকে সেদেশে আগমনের জন্য।

সে কাহিনীর আগে পৃথিবীর মালভূমি নামে পরিচিত তিব্বত সম্পর্কে আমরা সামান্য কিছু কথা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবো।

ভারতবর্ষের উত্তরে উত্তুঙ্গ হিমালয় পর্বতমালা। নগাধিরাজ হিমালয়ের উত্তরে উচ্চ মালভূমি তিব্বত। বিশাল ভূখণ্ড। পার্বত্য প্রদেশে ঘেরা মালভূমির উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে দশ থেকে আঠারো হাজার ফুট। পূর্বে পামির গ্রন্থি, দক্ষিণে কাস্তের মতো বঙ্কিমরেখায় অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালা। উত্তরদিশায় কুনলুনশান ও তার উত্তরে আস্তিনতাগ-নানশান পর্বতমালা। পশ্চিমে পার্বত্যপ্রদেশের পরে চিন সমভূমি। মধ্যদেশে কৈলাস পর্বতমালা-নায়েনচেনটাংলা রেঞ্জ ও চাংতাং-টাংলা রেঞ্জ সমান্তরাল অবস্থানে পূর্ব-পশ্চিমে বিন্যস্ত। পশ্চিম তিব্বতের দক্ষিণে মানস সরোবর থেকে নির্গত পূর্বগামী সাংপো-ব্রহ্মপুত্র নদ আর পশ্চিমগামী সিন্ধু ও শতদ্রু নদ। পূর্ব তিব্বত থেকে পূর্বদিকে ও দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হচ্ছে হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং, মেকং ও সালউইন নদী। রাজ্যে বৃষ্টিপাত হয় না। সবুজের হাহাকার তীব্র। রুক্ষ্ম বন্ধুর স্থান। সুতরাং জনবসতি কম।

দেশটার প্রাচীন নাম 'পোদ-য়ুল' বা 'খোং-য়ুল'। সেকথার অর্থ 'বরফের দেশ'। নামেই দেশের পরিচয়। পরে নাম হয় 'বোড'। চিনারা বলত 'তুফান'। তুর্কীরা 'তুপুত'। মুসলমানরা ও পরে ইউরোপীয় পর্যটকরা বলত 'টুব্বেত' বা 'তিব্বত'। দীর্ঘকাল বর্হিজগতের কাছে ছিল নিষিদ্ধ দেশ। আজও প্রায় তাই। দুর্গম অবস্থানের জন্য তো বটেই।

বুতোন বলেছেন — কৌরব-পাণ্ডব মহাযুদ্ধের শেষে রাজা রূপতি সহস্র সেনা সহ নারীর ছদ্মবেশে দুর্গম হিমালয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিব্বতীরা তাদের বংশধর।

শরৎ চন্দ্র দাস বলেছেন — রাজা রূপতি পু-গিয়াল (তিব্বত) রাজ্যে পৌঁছে দেখেন সেখানে তখন কিছু আদিম মানুষজন বসবাস করছে। তাদের কোন রাজা নেই। তারা রূপতিকে রাজা হিসেবে গ্রহণ করল।



গোস লোসাব মতে — লিচ্ছবি বংশীয় একজনকে প্রথম রাজপদে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল। 'মঞ্জুশ্রী-মূল-তন্ত্র' তার সাক্ষ্য দেয়। বুতোন লিখেছেন — তিব্বতীদের প্রথম রাজা কোশলরাজ প্রসেনজিতের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। আরেক মতে বৎসরাজ উদয়নের এক অস্বাভাবিক দেহধারী পুত্র জন্মের পর পরিত্যক্ত হয়েছিল। পরে ঐ পুত্র তিব্বতে চলে যায় এবং বোন-পুরোহিতগণ দ্বারা রাজপদে অভিষিক্ত হয়। সেই হল তিব্বতের প্রথম রাজা। নাম 'ন-খ্রি-সান-পো' বা 'ন্যায়ত্রি তেনপো'।

আরেক পৌরাণিক মতে — একপাওয়ালা, হাঁসের পায়ের মতো আঙুল-জোড়া, দীর্ঘ জিহ্বাযুক্ত প্রাণী 'থিয়ুরাং' থেকে তাদের প্রথম রাজার জন্ম। পুয়োউ অঞ্চলে। ভয়ানক দেখতে বলে বোন-ধর্মাবলম্বীরা তাকে তিব্বতে নির্বাসন দেয়। এই রাজা ইতিহাসে নেই, রয়ে গিয়েছে পুরাণকথায়। তবু তাঁর সময়কাল খৃষ্টপূর্ব ৩১৪ বা ২৫০ বা ৫০ বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করার চেষ্টা করছেন।

অন্য পৌরাণিক মতে — তিব্বতীরা নিজেদের হনুমান বা হিলুমাণ্ডজু-র ও তারা (গ্রোলমা)-র বংশজ মনে করে। তবে সেই হনুমান (পা-দ্রেংগেন-চাং-চোপ-সিমপা) রামভক্ত হনুমান নয়, অবলোকিতেশ্বর (শেনরাজিগ)-এর প্রতিভূ হনুমান।

ফ্রাংক অনূদিত 'ক্রনিকাল অব লাদাখ' গ্রন্থে 'ন-খ্রি-সান-পো'-র আসল নাম বলা হয়েছে বুদ্ধশ্রী। ইনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের পঞ্চপুত্রের একজন। 'লাসা শিলালিপি' থেকে আরেক প্রাচীন রাজার নাম জানা যায় — 'ও-দে-পার-গিয়াল'। তবে পরবর্তী আর কোন সূত্রে তাঁর নাম উঠে আসেনি। তার একটা কারণ হতে পারে এই — তিব্বতী সমাজে বুদ্ধের উত্তরাধিকার স্বরূপ কোন-না-কোন মর্যাদা পাওয়ার জন্য তীব্র বাসনা।

লোকপ্রবাদ অনুসারে তিব্বতে প্রাচীন সাতাশজন রাজার নাম শোনা যায়। প্রথম সাতরাজার আমলে বোন ধর্মের ও পূর্ববর্তী 'ডল-বোন' নামক আরাধনা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কথিত আছে, প্রথম রাজাদের সঙ্গে স্বর্গের যোগ ছিল 'মুথাগ' নামক রজ্জুর মাধ্যমে। মৃত্যুর পরে তারা সোজাসুজি স্বর্গে চলে যেতে পারতেন। কয়েক পুরুষ পরে ইয়ারলুং উপত্যকার রাজা দ্রিগাম সেনপো-র সময় দ্বন্দ্বযুদ্ধে ওই রজ্জু কাটা পড়ে। তখন থেকে তিব্বতী রাজারা আর সোজা স্বর্গে উঠে যেতে পারেন না। মৃত্যুর পরে তাদের মৃতদেহ ফেলে রাখা হতে থাকে। প্রেতকর্ম করত বোন পুরোহিতরা।

ঐ সাতাশ জন প্রবাদী রাজার পরে আসে 'লা-থো-থো--রি-আঁন-সান' নামে এক রাজার কথা। তাঁর প্রাসাদের নাম 'ইয়ামবু-লাখাং' বা 'উমবু-জ্যান্স-খর'। তাঁর রাজত্বকালে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। আকাশ থেকে এক পেটিকা প্রাসাদ-শীর্ষে নেমে আসে। পেটিকার ভিতরে ছিল মহাযানী 'করণ্ড-ব্যূহ-সূত্র' (জা-মা-টোগ), পূজাপদ্ধতির শতেক উপদেশ (পাং-কোং-ফায়াগ-গ্যা-মা) ও একটি স্বর্ণনির্মিত চৈত্য।

অলৌকিক এ ঘটনা ঘটে ৩৩১ খৃষ্টাব্দে।

তখন থেকে তিব্বতে পবিত্র ধর্মের সূচনা হয়। করণ্ড-ব্যূহ-সূত্র আসলে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের গুণাবলী-কীর্তন। ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ ও তাঁর শক্তি( পাণ্ডরা হতে পদ্মকুলে মহাকারুণিক অবলোকিতেশ্বর উৎপন্ন। ইনি বর্তমান ভদ্রকল্পের বিধাতা – সমগ্র সৃষ্টি র( া করেন। রাজা লা-থো-থো--রি-আঁন-সান পেটিকা থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারেন নি। তখন তিব্বতে লেখ্য বর্ণমালা ছিল না। শি( া-শাস্ত্র ছিল না। তারা ঘটনাটিকে দেবতার আশীর্ব্বাদ মনে করল এবং ঐ দানের জন্য প্রচলিত রীতিতে পূজার্চনা করতে শুরু করল। তিব্বতীদের কাছে রাজা লা-থো-থো-রি সমন্তভদ্রের অবতার স্বরূপ। ধ্যানী বুদ্ধ বৈরোচন ও শক্তি( লোচনা হতে উৎপন্ন বোধিসত্ত্ব সমন্তভদ্র (কুন-তু-জ্যাং-পো)। এ ঘটনার মধ্যে রহস্যের সঙ্কেত মেলে। তবে কি আসলে ধর্ম বিস্তারের জন্য বৌদ্ধ প্রচারকগণ তিব্বতে এসেছিলেন? চিন থেকে বা ভারত থেকে? শোনা যায়, ভারত থেকে বুদ্ধিরি( ত নামের একজন তিব্বতে ধর্মপ্রচারে গিয়েছিলেন !

ভগবান বুদ্ধের জীবনকাল খৃষ্টপূর্ব ৫৬৩ থেকে আশি বছরকাল ব্যপ্ত। তাঁর মহানির্বাণের পরেই বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা ধর্মপ্রচারে নেমে পড়ে। দেশেদেশান্তরে পা বাড়ায়। সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম রাজ-আনুকূল্য লাভ করে দেশের সর্বত্র এবং বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করেছে কাশ্মীর-আফগানিস্তান হয়ে মধ্য এশিয়ায় ও চিনে, নেপাল-ভূটানে ও শ্রীলঙ্কায়। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ঘটে সম্ভবত সবার শেষে। তবে কবে থেকে শুরু হয়েছিল তা সঠিক বলা সম্ভব নয়।

বৌদ্ধধর্মের আগে তিব্বতের প্রাচীন ধর্ম ছিল 'বোন' বা 'পোন'। আমদো এলাকার ঝাংঝুং-সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত বোন ধর্ম অন্যান্য দেশের আদিম সমাজের মতো একটি আদিম ধর্মমত – তন্ত্রমন্ত্র, জাদুবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, তুকতাক ইত্যাদি নানা লোকবিশ্বাসে ভরপুর। তিব্বতে অন্তত বিশ হাজার বছর ধরে মনুষ্যবসতি ছিল। হয়তো আরো প্রাচীন সময়কাল থেকে মানুষের পদধূলি পড়েছিল। পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সেকথাই বলে।

লা-থো-থো-রি-আঁন-সানের চার পুরুষ পরে তিব্বতের ইতিহাসে রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। সম্ভবত ৫৮১-৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'নাম-রি-স্রোং-সান' নামের এক শক্তি(শালী শাসকের হাতে মধ্যতিব্বতের অর্ধসভ্য জাতিগুলি একত্রিত হয়। ত্র(মে এক পরাত্র(মশালী রাজ্য জন্মলাভ করে। লাসার দ( ণ-পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদীতীরস্থ ইয়ারলুং অঞ্চলের শাসক ছিল তারা। কথিত আছে, তিন ল( সেনা নিয়ে নাম-রি-স্রোং-সান মধ্য ভারতে অভিযান করেছিলেন। চিন রাজদরবারে রাজদূত পাঠিয়েছিলেন।

তাঁর সুযোগ্য পুত্রের নাম স্রোং-সান-গাম-পো (স্রোং-সান-বাম-পো, ৬২৯-৬৬২ খৃষ্টাব্দ)। সম্ভবত ৬২৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন (মতান্তরে ৫৬৯ খৃষ্টাব্দে)। মাত্র তেরো বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। লাসা ছিল তাঁর রাজধানী। বর্তমানকার পোতালা প্রাসাদের জায়গায় একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। সেই সূত্রে তিনি পোতালা প্রাসাদ



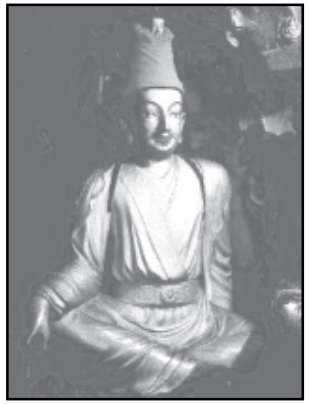

চিত্র-৬ রাজা স্রোং-সান-গাম-পো

নির্মাতা। দেশে আইনী শাসন-প্রবর্তনের সূচনাও তাঁর কীর্তি। তাঁর আমলে তিব্বতে চালু হয়েছিল মালবেরি-চাষ, রেশমীপোকার চাষ, পানিচাক্কি, কালি-কাগজ ও বর্ষপঞ্জী।

তখন নেপালের রাজা ছিলেন ঠাকুরবংশীয় অংশুবর্মন। রাজকন্যার নাম ভৃকুটি। স্রোং-সান-গাম-পো রাজা অংশুবর্মনকে জানালেন – আমি বর্বর তিব্বতের রাজা, দশ শীল পালন করি না, কিন্তু আপনি যদি সদয় হয়ে আপনার কন্যাকে আমার হস্তে অর্পণ করেন এবং ইচ্ছা পোষণ করেন যে আমি ধর্মানুবর্তী হই, তবে পঞ্চসহস্রদেহধারী হয়ে আমি দশশীল পালন করব ... এবং পঞ্চসহস্র মন্দির নির্মাণ করব।

তিব্বতরাজেব পরাত্র(ম স্বীকার করে নিয়ে নেপালরাজ স্বীয় কন্যার সঙ্গে. তাঁর বিবাহ দিলেন। কূটনৈতিক শুভকর্ম হাসিল করতে দৌত্যকার্য করেছিলেন তিব্বতের বুদ্ধিমান মন্ত্রী – থোনমি (থামমি) সম্ভোট। বৌদ্ধ রাজকন্যা নেপাল থেকে তিব্বতে গেলেন আরাধ্য দেবতা অ( াভ্যবজ্র (মিকোদ দোর্জে), মৈত্রেয় ও তারাদেবীর মূর্তি সঙ্গে করে। রাজা নবোঢ়া পত্নীর ধর্মসাধনাকে সমর্থন জানিয়ে ভজনমন্দির নির্মাণ করে দিলেন। সেখানে ঐ সকল দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল।

চিনের শাসক তখন সম্রাট তাং তাই-সুং। উত্তরে চিনের শাসক সেং-গে-সান-পো। শোনা যায়, চিনারাজা নানা উপঢৌকন পাঠিয়ে শক্তি(শালী তিব্বতের সঙ্গে সন্ধিপ্রস্তাব রাখেন। আরেক তিব্বতী মন্ত্রী গার-তোন-সান এই সন্ধির ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু চিন অনুরোধ মতো তিব্বতের রাজদরবারে চিনা রাজকন্যা পাঠাতে অসম্মত হল। তখন দুই ল( সেনা নিয়ে তিব্বতের রাজা চিনের লুং-সান আত্র(মণ করে বসলেন। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে পরাস্ত চিনের রাজা বিবাহার্থে রাজকন্যাকে তিব্বতে পাঠাতে সম্মত হলেন। বৌদ্ধমতাবলম্বী চিনের রাজকন্যা ওয়েন-চেং-কুং-চু (কিমসিং কোঞ্জো) বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তিব্বতে পাড়ি দিলেন শাক্যমুনি বুদ্ধের মূর্তি সঙ্গে নিয়ে। কয়েকখানি বৌদ্ধশাস্ত্রও তাঁর সঙ্গে ছিল। মূর্তি দুটি নাকি ভারত থেকে নির্মিত হয়েই চিনে প্রেরিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক সেই মূর্তিগুলি লাসার জোখাং ভজনমন্দিরে বর্তমান।

বিদেশ থেকে আসা দুই রাজকন্যাই তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সূত্রপাত ঘটালেন। বোনধর্মে অনুগত রাজা বৌদ্ধ পত্নীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ত্র(মে বৌদ্ধ মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়লেন। দেশে সদ্ধর্মের চর্চা প্রবলতর হল। রাজধানীতে রাজমহিষীদের আনা মূর্তির

জন্য দুটি বিহার নির্মিত হল। রা-মো-চে বিহার ও রাসা (ফল-লং-সংগক?) বিহার। প্রথমটি এখনো বর্তমান। দ্বিতীয়টি চিনাদের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে। লাসার উত্তরে চিনা রাজকুমারী দ্বারা নির্মিত রামোচে বিহারে প্রতিষ্ঠিত হল নেপালী রাজকুমারীর আনা অ(াভ্যবজ্র মূর্তি। তাঁরই উৎসাহে নির্মিত রাসা (লাসার প্রাচীন নাম) বিহারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চিনা রাজকুমারীর আনা শাক্যমুনির মূর্তি।

পরিব্রাজক শরৎ চন্দ্র দাস ১৮৮২ সালে জোখাং ভজনমন্দির ও রামোচে বিহার দর্শন করে লিখে গিয়েছেন — লাসার জোখাং ভজনমন্দিরে উপরতলার প্রার্থনাক( সোনা-রূপো-তামা-লোহা-দস্তার সমন্বয়ে অপূর্ব সুন্দর বুদ্ধমূর্তি আছে। সেটি বুদ্ধের জীবিতকালেই নাকি মগধে তৈরী হয়েছিল। ইন্দ্রের তত্ত্বাবধানে বিশ্বকর্মা দ্বারা নির্মিত। যবনদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চিন প্রভূত সাহায্য করেছিল বলে পুরস্কার স্বরূপ মগধের রাজা মূর্তিটি চিন সম্রাটকে উপহার দিয়েছিলেন। যৌতুক হিসেবে চিনা রাজকুমারী কোঞ্জো (ওয়েন-চেং) ঐ মূর্তি লাসায় নিয়ে আসেন। এক মানুষ সমান উঁচু মূর্তি তরুণ রাজকুমার-বেশী বুদ্ধের। মুকুটখানি ধর্ম-সংস্কারক সোংখাপার দান। বুদ্ধমূর্তির দু'পাশে মৈত্রেয় ও দীপঙ্কর বুদ্ধ। আছে বুদ্ধের বারো প্রধান শিষ্য। ... তিনতলা রামোচে মন্দিরের সামনে রয়েছে অতি প্রাচীন চিনা শিলালিপি। মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ মিকোদ-দোর্জের (অ(াভ্যবজ্র) মূর্তি। নেপালী রাজকুমারী স্বহস্তে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মূর্তির অপ্রচলিত শিল্পনিদর্শন মনোমুগ্ধকর। ... ঐ রামোচে বিহার-স্থানের সঙ্গে নাকি নরকের যোগ ছিল এবং সেখানে স্ফটিকের অট্টালিকা ছিল। সংর(িত স্মারকগুলির মধ্যে দোলমা (তারা) মূর্তি আছে। তিব্বতীদের কাছে চিনা রানী হলেন দোল-কর (শ্বেততারা) এবং নেপালী রানী দোল-জাং (সবুজ-তারা)। শেষজনের কাছে মহিলারা উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করে। মূর্তি নির্মিত হয়েছে আশমানি রঙের নীলকান্তমণি দিয়ে।

পোতালা প্রাসাদ নির্মাণও তখন শুরু হয়। মারপোরি বা লাল পাহাড়ে পোতালা প্রাসাদ এবং কাগপোরি বা লোহা পাহাড়ে আরেকটি প্রাসাদ। উভয় পাহাড় সংযুক্ত( হবে লৌহশৃঙ্খলের সেতু দিয়ে।

তিব্বতে তখন বর্ণমালার প্রচলন ছিল না। দূরদর্শী রাজা স্রোং-সান গাম-পো জনৈক অনুর পুত্র তোন-মি সম-বো-টা বা থোনমি সম্ভোট নামের প্রাজ্ঞ মন্ত্রীকে কাশ্মীরে পাঠালেন। থোন (তোন) অঞ্চলের মানুষ (মি) তিনি। তাই নামের আগে থোন-মি (তোন-মি)। ইনিই নেপালের রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহপর্বে দৌত্যকার্য করেছিলেন। মন্ত্রীর সঙ্গে ছিল আরো ষোলোজন শি(ার্থী। থোনমি সম্বোট ভারতের ব্রাহ্মণ আচার্যদের নিকট নানাবিষয় শি(ালাভ করেন। আচার্যদের মধ্যে একজন হলেন দেববিদ্যাসিংহ বা দেববিৎসিংহ বা সিংহঘোষ বা সিংহলাদ (লাই-রিগ-পা-সেং-গে বা সেং-গে-গ্রা)। তাঁর কাছে ব্যাকারণ শি(া করেন। আরেকজন শি( কের নাম লি-বাইন। তাঁর কাছে বর্ণমালা রচনার কৌশল



শেখেন। লি-বাইন ভারতীয় ভাষ্যে লিপিদত্ত হতে পারে কিংবা লি-নামের স্থানের লোক। লি স্থানটি নেপালে, খোটানে বা তুর্কিস্থানে হলেও হতে পারে।

তিব্বত হিমশীতল দেশ। ভারতের উষ( আবহাওয়া সহ্য করতে না পেরে ষোলো তিব্বতী শি(ার্থীর অকালমৃত্যু হল। একমাত্র সম্ভোট ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আয়ত্ত করে ভাষা এবং লিপিমালা করায়ত্ত করে দেশে ফিরলেন। জেনে রাখা ভালো, তখন ভারতে ব্রাহ্মীলিপির এক বিবর্তিত রূপ প্রচলিত ছিল। ঐ লিপির সঙ্গে তিব্বতী বর্ণমালার মিল খুব।

রাজা তখন পত্নী উ-রু সমভিব্যাহারে প্রমোদকাননে। জিজ্ঞাসা করলেন — ভাষা ও বর্ণমালা শেখা হয়েছে তো?

থোনমি শ্লোক করে বললেন — শাল-রাস-সাল-লা-নাঁড-ডানস-গাং-বা-জাং। (এর অর্থ — অবলোকিতেশ্বরের নিকট সুন্দর ও পরিপূর্ণ সদ্যপ্রস্তুত সুগন্ধি দান করা হল।)

তুষ্ট রাজা 'বাইং-গাই-খোড-মার-ডো' মন্দির নির্মাণ করে তিব্বতের প্রথম লিপি হিসেবে ঐ কথাগুলি পাথরে উৎকীর্ণ করে রাখলেন। ভারত থেকে কুমার, নেপাল থেকে শীলামঞ্জু, কাশ্মীর থেকে টাবুট ও গানুট, ব্রাহ্মণ লি-বাইন এবং চিন থেকে লোসাং মহাদেব তখন তিব্বতে আহুত হয়েছিলেন।

থোনমি ভারতীয় ও খোটানের লিপিধারা অনুসরণ করে ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ ও চারটি স্বরবর্ণসহ চৌত্রিশটি অ( র নিয়ে তিব্বতী লিপিমালা গঠন করলেন। লাসার মা-রু মন্দিরে বসে। তারপর শুরু হল বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদের কাজ। অনেক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্বয়ং রাজা চার বৎসর সম্ভোটের কাছে লিপি শি(া করলেন। তারপর বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করতে সমর্থ হলেন। নেপাল থেকেও অনেক ধর্মগ্রন্থ আনা হয়েছিল। অনুবাদকর্মে ধর্মঘোষ ও লালুংয়ের পাল-গাই-দো-জে অংশ নিয়েছিলেন।

কুড়ি বছর রাজত্ব করার পরে স্রোং-সান গাম-পো ৬৬২ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন (মতান্তরে ৬৫০ খৃষ্টাব্দে)। তিব্বতীরা স্রোং-সান গাম-পো রাজাকে 'বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর' জ্ঞান করে। নিঃসন্তান দুই রাজমহিষীদের মধ্যে নেপালী রাজকুমারীকে 'সবুজ তারাদেবী' এবং চিনা রাজকুমারীকে 'শ্বেত তারাদেবী' মনে করে। তাঁদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে লাসার ভজনমন্দিরে।

পরবর্তী রাজা (পুত্র না পৌত্র?) মং-স্রোং-মং-সান (কিলি-পা-পু) গিলগিটের রাজকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন। গিলগিট কাশ্মীরের উত্তরাংশে পার্বত্যপ্রদেশে অবস্থিত। বর্তমানে অধিকৃত আজাদ কাশ্মীরে। তার পরে ৬৭৯ খৃষ্টাব্দে দু-স্রোং-মং-পো-জে রাজা হলেন। পুত্র মেস-অগ-সোমস্ (খ্রি-দে-সাগ-তান) রাজা ছিলেন ৭৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর পুত্র খ্রি-স্রোং-দে-সান। রাজত্বকাল ৭৫৫-৭৯৭ খৃষ্টাব্দ। মতান্তরে ৭৪০-৭৮৬ খৃষ্টাব্দ। তাঁর মাতা ছিলেন চিনদেশীয় বৌদ্ধনারী চিন-চেঙ-কুং-চু যার বিবাহ নিয়ে আকর্ষণীয় কাহিনী প্রচলিত আছে।

মেস-অগ-সোমসের রাজত্বে প্রভূত ( মতাশালী মন্ত্রী ছিলেন মা-ঝাং বা মা-সাং। এই প্রবল বৌদ্ধবিরোধী মন্ত্রীর কারণে লাসা থেকে বুদ্ধমূর্তি নেপালের সীমান্তবর্তী কাইরঙে স্থানান্তরিত করতে হয়। চিনের বৌদ্ধপুরোহিতকে রামোচে বিহার থেকে ফিরে যেতে হয় চিনে। রাজা বুদ্ধের অনুগত হলেও তাঁর ( মতা তেমন ছিল না। অবশ্য কয়েকজন ধর্মানুগত মন্ত্রী ছিলেন তাঁর সঙ্গে — সাংশি, সাল-স্নাং, গোস-গান ইত্যাদিরা ।

সাল-স্নাং নেপাল ও বুদ্ধগয়া দর্শন করে 'জ্ঞানেন্দ্র' নামে ভূষিত হয়েছিলেন। ইনি নেপালে গিয়ে আচার্য শান্তর( তের সঙ্গে সা( াত করেন। দেশে ফিরে রাজাকে জানিয়েছিলেন ভারতীয় আচার্যকে তিব্বতে আমন্ত্রণ করার কথা। সেকথা শুনে রাজা বললেন — চুপ চুপ একথা কানে গেলে আপনাকে মা-সাং শাস্তি দিতে পারে। তাড়াতাড়ি পালিয়ে যান। আমি গোপনে গোস-গান ও অন্যদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করব। তারপর উপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানাবো।

তারপর একদিন রাজার সঙ্গে মন্ত্রণা করে বৌদ্ধমন্ত্রী গ্রোস-গান ধর্মনাশক মন্ত্রী মা-সাংকে টোড-লুংস নামক স্থানে এক গভীর গর্তে ফেলে গর্তের মুখে পাথরচাপা দিয়ে জীবন্ত কবরস্থ করল। মাসাং-এর মৃত্যু হলে আচার্য শান্তর( তকে তিব্বতে নিয়ে যাওয়ার পথ সুগম হল।

তিব্বতরাজ খ্রি-সোং-দে-সানের আমন্ত্রণে আচার্য শান্তর( ত তিব্বতে গিয়েছিলেন। তিব্বতীরা তাঁকে 'জি-বা-সো' বা 'শান্তির র( ক' তথা 'শান্তিজীব' নামে অভিহিত করে। লাদাখের আলচি বিহারে তাঁরই নাম 'শান্তিপা'। ইনি ধ্যানীবুদ্ধ অ( োভ্যর বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণির অবতার রূপে গণ্য। 'খেনপো বোধিসত্ত্ব' বা 'ভি( বোধিসত্ত্ব' নামেও পরিচিত। বজ্রপাণিকে তিব্বতী বলে চিয়াগ-না-দোর্জে।

শান্তর( ত দীপঙ্করের মতো আরেক বঙ্গসন্তান। পূর্ব বাংলার 'সাহোর' বা 'জাহোর' নামক স্থানে কোন এক রাজবংশে জন্মেছিলেন। সম্ভবত দশম শতকে অতীশ দীপঙ্করের জন্ম যে বংশে ইনিও সেই বংশের লোক। বৌদ্ধভি( জ্ঞানগর্ভ তাঁকে দী( া দেন। উত্তরকালে শান্তর( ত নালন্দা ও বিত্র(মশীল বিহারের আচার্য হয়েছিলেন।

নালন্দা থেকে তিনি কেন নেপালে গিয়েছিলেন তা জানা যায়নি। সেখানে তিব্বতী মন্ত্রী সাল-স্নাং-এর সঙ্গে সা( াত হয়। মন্ত্রী তাঁকে তিব্বতে ধর্মপ্রচারের জন্য আহ্বান জানিয়ে রাখেন। পরে বৌদ্ধবিরোধী মন্ত্রী মা-সাংয়ের মৃত্যু হলে সাল-স্নাং রাজাদেশে পুনরায় নেপালে গমন করেন এবং শান্তর( তকে আমন্ত্রণ জানান। তিব্বতে যেতে তখন তাঁর আর কোন বাধা ছিল না। আচার্য শান্তর( ত লাসায় গেলেন।

তিব্বতের রাজা নাকি আচার্য শান্তর( তের জ্ঞানবুদ্ধি সম্পর্কে খোঁজখবর করতে তিনজন তিব্বতীকে নিয়োগ করেছিলেন। তারা আচার্যের সঙ্গে দেখা করেছিল বটে তবে তাঁর কথাবার্তা কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। তখন তারা কাশ্মীরের অনন্ত নামের এক



পণ্ডিতকে নিয়োগ করল। আচার্য কী বলেন তা শুনে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে। যতদূর তিন তিব্বতী জানতে পেরেছিল, রাজাকে সব জানিয়েছিল। বলেছিল — আচার্য শান্তর( ত পরম ধার্মিক এবং তাঁর মনে কোন কুচিন্তা নেই। এরকম মতামত পাওয়ার পরেই আচার্যকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

কয়েকজন মন্ত্রীকেও রাজা বলেছিলেন শান্তর( তের মতাদর্শ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতে। মন্ত্রীরা আচার্যদেবকে প্রশ্ন করেছিলেন — আপনার মতবাদ কি?

শান্তর( ত উত্তরে বলেন — আমার মতবাদ হল, যুক্তি( দ্বারা পরী( া করে যা কিছু সত্য মনে হয়, তার অনুসরণ করা( যা যুক্তি(সিদ্ধ নয়, সেসব উপে( া করা।

একথা রাজার মনে ধরেছিল। তারপর উপাধ্যায়কে তিব্বতে ধর্মপ্রচারে অনুমতি দেওয়া হল। সুং-শাগ প্রাসাদে বসে তিনি চার মাস ধরে দশ শীল তথা সদাচার, আঠারো ধাতু, বারোটি কার্যকারণ পদ ও আট অকর্তব্য সম্পর্কে রাজাকে শি( াদান করলেন। কাশ্মিরী পণ্ডিত অনন্ত দোভাষীর কাজ করেছিল।

উপাধ্যায় শান্তর( ত মহাযান শাখার যোগাচার সম্প্রদায়ভুক্ত( ছিলেন। তিনি 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামক দার্শনিক ভাবনা-সমৃদ্ধ অসামান্য যুক্তি(বাদী একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর মতো জ্ঞানীর প( যে ধরনের ধর্মপ্রচার সম্ভব, তা অনুধাবন করার মতো মুক্ত(মনের মানুষ তিব্বতে তখন খুবই কম ছিল। আসলে তিব্বতে শান্তর( তের দ্বারাই সর্বপ্রথম শাক্যমুনি প্রবর্তিত যথার্থ ন্যায়ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। তবে একথাও সত্য, বোনধর্ম-প্রভাবিত তিব্বতীরা তখনও বুদ্ধের নীতিভিত্তিক ধর্মমতের যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেনি। আচার্যদেব তিব্বতীদের দশ-কুশল ও দ্বাদশ-নিদানের কথা বললেন। দ্বাদশ কার্যকারণের কথা বললেন। ব্যক্তি(জীবনে অষ্টাদশ মৌল উপাদানের কথা বললেন।

ত্র(মে শান্তর( তের ভাবনাচিন্তা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হল। তারই প্রকাশ ঘটল ধর্মবিরোধী নানা অশুভ শক্তি(র উত্থানে। ঘটনাচক্রে( তখন সমগ্র দেশে নানা দুর্দৈব ঘটছিল। প্রবল বন্যা, বজ্রবিদ্যুৎহানা, রোগের প্রকোপবৃদ্ধি, ফসলহানি ও পশুপ্রাণীহানি এমনধারা বিবিধ দুর্বিপাক। অবৌদ্ধ তিব্বতী প্রচারকেরা বলতে লাগল — এসব ঘটছে দেশে বৌদ্ধ ভাবনাচিন্তার কুফলে।

অপপ্রচারে আমজনতার মনেও ধীরে ধীরে বাসা বাঁধল একই অভিযোগ। বৌদ্ধবিরোধী মন্ত্রীরা সুযোগ পেয়ে বলতে শুরু করল — ঐ ভারতীয় সন্ন্যাসীর জন্য এসব কাণ্ড ঘটছে( তাঁকে দেশ থেকে তাড়ানো দরকার।

রাজা বাধ্য হয়ে শান্তর( তকে সব কথা বিস্তারে জানালেন। প্রত্যুত্তরে উপাধ্যায় রাজাকে বললেন — ঠিক আছে রাজন, আমি নেপালে ফিরে যাব। তিব্বতী অসুরেরা দেখছি বেজায় অখুশী। জম্বুদ্বীপে পদ্মসম্ভব নামে একজন পণ্ডিত আছেন। আমি তাঁকে তিব্বতে যেতে অনুরোধ করবো। আপনিও তাঁকে নিজে থেকে আমন্ত্রণ করুন।

তিব্বতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবধারা উৎপাটিত করে সদ্ধর্মের প্রচার করতে আচার্য শান্তর(িত একা সফল হতে পারেন নি। তিনিই রাজাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন মহাযান যোগাচার সম্প্রদায়ের পণ্ডিত পদ্মসম্ভবকে তিব্বতে আহ্বান করে নিয়ে যেতে। পদ্মসম্ভব তখন বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনায় অগ্রগণ্য পণ্ডিত।

উদয়ন বা উর্গিয়ান রাজ্যের রাজা ইন্দ্রভূতি বা ইন্দ্রবোধির পুত্র ছিলেন পদ্মসম্ভব। হিউয়েন সাঙ যে উদয়ন রাজ্যের কথা বলেছেন, সেটি সোয়াট উপত্যকায় অবস্থিত। সুবাস্তু নদী আছে সে রাজ্যে। চারদিকে পাহাড় আর ঘন জঙ্গল। অধিবাসীরা জ্ঞানলাভের জন্য বিদ্যাশি(া করে না। ভোজবাজি ও তন্ত্রমন্ত্র পছন্দ করে। রাজধানীর নাম মঙ্গলৌর। এসব কথা বলে হিউয়েন সাঙ ভারতভ্রমণ কাহিনীতে বলে গিয়েছেন।

পদ্মসম্ভব-এর জন্ম সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। অবশ্য মহামানবদের অতিমানব নির্মাণকল্পে অলৌকিকতার অবতারণা এক অনিবার্য প্রক্রি(য়া। একদা কোন এক পবিত্র ( ণে উদয়ন রাজ্যের পবিত্র জলাশয়ে এক ঝলক রক্তি(ম আলো বিদ্যুতচমকের মতো ঝলসে উঠেছিল আর জলাশয়ের মধ্যে ফুটে উঠেছিল অতি সুন্দর এক শতদল। তার উপর অমিতাভ বুদ্ধ অবতার রূপে নেমে এসেছিলেন অষ্টমবর্ষীয় বালকের রূপ ধারণ করে। পদ্মে জাত বলে তিনি 'পদ্মসম্ভব' নামাঙ্কিত।

তাঁর বাল্যবয়সের অনেক আশ্চর্য ঘটনা আছে। একবার তৃষ(ার্ত হয়ে মদ্যবিপণিতে প্রাণভরে সুরাপান করছিলেন সঙ্গীসাথীদের নিয়ে। যখন মনে পড়ল যে সুরার মূল্য দেওয়ার মতো অর্থ তাঁর কাছে নেই, তখন দোকানীকে বুঝিয়েসুজিয়ে ব্যবস্থা করা হল যাতে সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত সুরার মূল্য শোধ করার সুযোগ থাকে আর তত( ণ অবধি সুরাপান করে যেতে বাধা নেই। এরপর একদিকে চলল অঢেল সুরাপান। অন্যদিকে পদ্মসম্ভব আকাশচারী সূর্যকে আটক করে রাখলেন। সাত সাতটা দিন। দিনান্তের সন্ধ্যা নেমে এলো না। অবিরত দিবালোক ঝলমল করছে চারদিক। প্রমাদ গুনলেন দোকানী। সুরার ফোয়ারা থামছে না। নিরূপায় হয়ে দোকানী সুরার মূল্য শোধ করা থেকে তাঁকে রেহাই দিয়ে বাঁচলেন। নিশুতি রাত আবার স্বমহিমায় ফিরে এলো ধরাতলে। এভাবে পদ্মসম্ভবের অলৌকিক ( মতা বালক বয়স থেকেই প্রকাশিত হতে লাগল। সূর্যদেবকে আকাশে নিরস্ত করে রাখতে পারেন এমনই ( মতাবান তিনি।

চিত্র-৭ গুরু পদ্মসম্ভব

তান্ত্রিক যোগাচার্য পদ্মসম্ভব নালন্দা বিহারে কিছুকাল অধ্য( তা করেছিলেন। তাঁর একাধিক



পত্নী ছিল। একজন পত্নী ছিলেন শান্তর(িতের ভগিনী মন্দরবা। তিব্বতযাত্রায় মন্দরবা পদ্মসম্ভবের সঙ্গে ছিলেন। রাজা খ্রি-স্রোং-দে-লানের কন্যা খ্রোম-পা-গিয়ান ছিলেন তাঁর আরেক পত্নী।

পদ্মসম্ভব যখন কাশ্মীরের স্বাত বা সোয়াট উপত্যকার উড্ডিয়ানে, তিব্বত থেকে রাজদূত এসে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালো। এ ঘটনা হয়তো ৭৪৭ খৃষ্টাব্দের। রাজার নিমন্ত্রণ উপে(া করা সহজ নয়। তিনি তিব্বতের পথে যাত্রা করলেন। যাত্রাপথে তাঁকে বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হল। অলৌকিক ( মতাবলে ও তান্ত্রিক ক্রি(য়াকর্ম দ্বারা সেসব কাটিয়ে উঠতে স( ম হলেন তিনি। সেরকম দুএকটা ঘটনার উল্লেখ করা যাক।

একবার এক দেবী তাঁকে দুই পাহাড়ের মধ্যে পিষ্ট করে মেরে ফেলার আয়োজন করেছিলেন। তিনি ঋদ্ধি বলে আকাশমার্গে উঠে দেবীর ( মতা চূর্ণ করলেন। তারপর আবার তাঁকেই সদ্ধর্মর(ার কাজে নিযুক্ত( করলেন।

আরেকবার এক পিশাচী তাঁর উপর বজ্রনি(ে প করেছিল। তিনি তাঁকে এমনভাবে জলাশয়ে রূপান্তরিত করে ফেললেন যে তার জল টগবগ করে ফুটতে শুরু করল। পিশাচীর দেহ থেকে মেদ-মাংস গলে গলে খসে পড়তে লাগল। শুধু অস্থিকঙ্কালটুকু বেঁচে রইল। তবু পিশাচী নিজেকে প্রকাশ করছিল না দেখে পদ্মসম্ভব তাঁর ডান চোখে বজ্র নি(ে প করলেন। এরপর পিশাচী আত্মপ্রকাশে বাধ্য হল। প্রাণভোমরা নিবেদন করা ব্যতীত তার আর অন্য উপায় রইলো না। সেই থেকে ঐ পিশাচী শ্বেততুষার একচ( নিরমাস বজ্ররা( সী নামে পরিচিত হল।

গোস লোসাব লিখেছেন – তাঁর যাত্রাপথে বারোজন র(া-দেবী নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করে চলেছিল। কিন্তু গুরু পদ্মসম্ভব সকলকেই পরাস্ত করে তাঁদের আপন ধর্মে মতান্তরিত করে সদ্ধর্মের র( কে পরিণত করেছিলেন। 'গৌড়ের ইতিহাস'-এ পাই, ইনি নাকি তিব্বতের সাম্পু নদীকে পর্বতের ফাটলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে যুক্ত( করেন।

১৯২২ সালে তিব্বত ভ্রমণ করে স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন – পদ্মসম্ভব সম্পর্কে অনেক বিভূতি বা সিদ্ধাই প্রচারিত। তিনি আকাশে উড়তে পারতেন। নিজের মুখ অধোমুখ পরিবর্তিত করে নিতে পারতেন। মৃতব্যক্তি(র জীবনদান করতে পারতেন। বাতাসের মতো অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতেন। নদীর জলপ্রবাহকে উজানে বইয়ে দিতে পারতেন। হাত বাড়িয়ে উড়ন্ত পাখি ধরতে পারতেন।

গুরু পদ্মসম্ভবকে নিয়ে আরো অনেক কাহিনী তিব্বতে প্রচলিত। সর্বত্র দেখা যায় যে তিনি বিরুদ্ধ শক্তি(কে পরাভূত করে তাকেই ধর্মান্তরিত করেছেন এবং বৌদ্ধধর্ম র( ণের কাজে নিযুক্ত( করেছেন। নানা কাহিনীর অন্তরালে সারসত্য বোধ করি এরকম –পদ্মসম্ভব প্রাচীন ও প্রচলিত ভাবনা-বিশ্বাস পুরোপুরি বর্জন না করে তাকে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। সেসব আত্মস্থ করে ধর্মপ্রচারের কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। যে কাজে শান্তর(িত সফল

হতে পারেন নি, সেকাজে গুরু পদ্মসম্ভবের সাফল্যের পিছনে এটাই হয়তো রহস্য। বন ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মিশ্রণ ঘটিয়ে লামাতন্ত্রের উদ্ভাবনা তাঁরই আশ্চর্য কীর্তি।

তাঁর কর্মপ্রচেষ্টায় তিব্বতে বনধর্ম অনেকটাই পর্যুদস্ত হল। অবস্থার পরিবর্তন হলে আচার্য শান্তর( ত নেপাল থেকে তিব্বতে ফিরে গেলেন এবং লাসার অনতিদূরে ব্রহ্মপুত্র নদী পেরিয়ে সামিয়েতে বসবাস করতে লাগলেন। গুরু পদ্মসম্ভব সামিয়েতে একটি বিহার নির্মাণের পরিকল্পনা করলেন। আচার্য শান্তর( তের পরিচর্যায় ওদন্তপুরী বিহারকে আদর্শ করে বিহার নির্মাণের ব্যবস্থা হল। 'সাম-ইয়াস' বা 'সামিয়ে' বিহার নির্মাণব্যয় বহন করলেন রাজা খ্রি-সোং-দে-সান।

সামিয়ে মণ্ডলাকারে নির্মিত বিশাল বিহার – কেন্দ্রে বৌদ্ধ কল্পনা অনুসারে সুমেরু শিখরের স্থানে রয়েছে প্রধান মন্দির 'উৎসে'। চারদিকে চারটি বড়ো চোর্তেন। উৎসের চারদিকে চারটি 'লিংশি' মন্দির চার মহাদেশ-স্বরূপ। প্রতিটির দু'পাশে দুটি করে ছোট 'লিংত্রেন' মন্দির আটটি দ্বীপের প্রতিভূ – সব মিলিয়ে দ্বাদশ দেশ-মহাদেশ বিস্তৃত রয়েছে যেন জাগতিক মহাসমুদ্রে। উত্তরে 'নাইমা' (সূর্য) মন্দির ও দ( ণে 'দাওয়া' (চন্দ্র) মন্দির। বহির্ভাগে চতুর্দিকে দেওয়া হয়েছে লৌহবেষ্টনী।

ত্রিতল বিহারের উপরভাগ নির্মিত চিনাস্থাপত্য রীতি অনুসারে, মধ্যভাগ ভারতীয় রীতি অনুসারে এবং নিম্নভাগ তিব্বতীয় রীতি অনুসরণ করে। বিহারের সম্পূর্ণ নাম – 'সামিয়ে-মি-গ্যুর-লুহন-গাইস-গ্রুব-পাই-সাগ-লাগ-খাং'। একথার অর্থ – 'বিপুল অপরিবর্তিত ধ্যানলাভের শি( য়তন'। কেউ কেউ বলেছেন, ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে সামিয়ে নির্মিত হয়েছিল। অন্যমতে নির্মাণকাল ৭৮৭-৭৯১ খৃষ্টাব্দ।

১৮৭৪ সালে ভারতীয় পরিব্রাজক নৈন সিং তিব্বতে গিয়ে সামিয়ে বিহারে বাস করেছিলেন। লাসা থেকে ৩০ মাইল দ( ণ-পূর্বে সাংপো নদীর উত্তর তটে বিহারটি অবস্থিত। চারদিকে বালির পাহাড় আর সামান্য গাছপালা। প্রাচীন বিহারের কিছু নিদর্শন তখনও বিদ্যমান ছিল। চত্বরের মধ্যভাগে বিশাল মন্দির – চারটি বড়ো মহাবিদ্যালয়, আরো কিছু ভবন ঘিরে দেড় মাইল দীর্ঘ উঁচু প্রাচীর। চার মুখ্যদিশায় চারটি মুখ্য দ্বার। প্রাচীর-শীর্ষে অজস্র ইঁটের স্তূপ সাজানো( তার উপর ভারতীয় লিপিতে খোদাই আছে। মন্দিরে স্বর্ণময় দেবমূর্তি বর্ণোজ্জ্বল পোষাকে ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত। বিরাট গ্রন্থাগারে অনেক ভারতীয় ভাষায় লিখিত পুঁথি আছে যদিও চৌষট্টি বছর আগে অগ্নিসংযোগে অনেক গ্রন্থ ভস্মীভূত হয়েছিল।

১৮৮১ সালে শরৎ চন্দ্র দাস তিব্বত ভ্রমণে এসে সামিয়ে সফর করেন। তিনিও বলেছেন অগ্নিসংযোগে বহু গ্রন্থ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। তবে তাঁর হিসেবে সে ঘটনা ঘটেছিল ১৮২২ সালে। নৈন সিং বলেছেন ১৮১০ সালে।



বর্তমানে দর্শকগণ সামিয়ের প্রধান মন্দিরটিকে ছয়তলা বর্ণনা করেছেন। প্রথম তলে প্রধান সভাক( । প্রবেশপথে গুরু শান্তর( ত ও পদ্মসম্ভব, রাজা ত্রিসোং দেৎসান (খ্রি-সোং-দে-সান) ও সংসেন গ্যামপো (স্রোং-সান-গাম-পো)-র মূর্তি। ভজনালয় জোবোখাং-এ বুদ্ধের মূর্তি। সভাক( র বাঁদিকের ছোট মন্দিরে চেনরেজি লাখাং-এ সহস্রবাহু চেনরেজি মূর্তি এবং ডানদিকের গোখাং-এ ধর্মান্তরিত বোন দেবতাদের মূর্তি যারা বৌদ্ধদের র( ক দেবতা হয়ে উঠেছিল। উত্তর-পশ্চিমের মণি লাখাং-এ অপূর্ব সুন্দর মুরাল চিত্র আছে।

সামিয়ে বিহারে আচার্য শান্তর( ত প্রথম উপাধ্যায় মনোনীত হলেন। জীবনের অন্তিম পর্বে তেরো বৎসর তিনি ঐ বিহারের অধ্য( তা করেন। আচার্য শান্তর( ত ও গুরু পদ্মসম্ভব তিব্বতে ত্রিপিটক, মহাযান শাস্ত্র, তান্ত্রিক ও যোগাচার মতবাদ শি( া দিতে ও প্রচার করতে লাগলেন। সামিয়ে বিহারে প্রথম বসবাসকারী তিব্বতী ভি( ু ছিল 'ব্য-ত্রি(-জিগস'। আরেকজন ভি( ুর নাম হল 'বৈরোচন'। পদ্মসম্ভব তেরো বৎসর তিব্বতে কাটিয়ে তিব্বত থেকে হারিয়ে গেলেন। সম্ভবত ৭৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নেপালে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর শেষজীবন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এ বড়ো আশ্চর্যের কথা। হয় তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল অথবা অনুগত শিষ্য সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় অনুসারে তাঁর জীবনান্ত রহস্যাবৃত রাখা হয়েছিল। বৌদ্ধতন্ত্রশাস্ত্রে দ( তাঁর কুড়িজন সুযোগ্য শিষ্য ছিল।

চিত্র-৮ শরৎ চন্দ্র দাস

গুরু পদ্মসম্ভব বৌদ্ধভাবনার সঙ্গে তিব্বতে প্রচলিত বোন ধর্মের ভাবধারা মিশ্রিত করে যে লামাতন্ত্রের প্রচলন করলেন, তা অনুসরণ করে 'নিং-মা-পা' বা প্রাচীনপন্থী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। তিব্বতীরা তাঁকে লো-পোন (গুরু) বা রিন-পো-চে (অমূল্য গুরু) নামে শ্রদ্ধা করে। মঠে বিহারে রিনপোচে বা গুরু পদ্মসম্ভবের মূর্তি দেখা যায়।

একবার তিব্বতে চিনপন্থী বৌদ্ধ মতবাদের সঙ্গে ভারতীয় ভাবধারার বিরোধ দেখা দিল। চিনা মতবাদের প্রধান প্রবক্ত( া ছিলেন হোসাং মহাযান নামের এক বৌদ্ধপণ্ডিত। রাজার নির্দেশে বিতর্কসভা আহুত হল। শান্তর( তের এক শিষ্যের নাম কমলশীল। তিব্বতীরা বলে 'পেমে-গাং-সুল'। বিতর্কে অংশগ্রহণের জন্য ভারত থেকে তাঁকে তিব্বতে নিয়ে যাওয়া হল। এই কমলশীল আচার্য শান্তর( তের 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থের বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহকারে 'পঞ্জিকা' রচনা করেন। 'ন্যায়বিন্দুপূর্বপ( -সং( প্তি' তাঁরই রচনা। বর্তমানে এর তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যায়। 'তাঞ্জুর'-এ কমলশীলকে দশ-বারো গ্রন্থের রচয়িতা বলা হয়েছে। ইনি কিছুকাল নালন্দায়ও তন্ত্রের অধ্যাপনা করেছিলেন। সামিয়ে বিহারে সেই বিতর্ক কি ৮৪৬ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছিল? যবেই হোক না কেন, সেবার ভারতীয়

প(ই জয়লাভ করে। পরাস্ত চিনা বৌদ্ধরা তিব্বত থেকে নির্বাসিত হয়। চিনাদের অনেকে পরাজয়ের অপমান মেনে নিতে পারেনি। কেউ কেউ বুক চাপড়ে চাপড়ে মারা যায়।

চিত্র-৯ কমলশীল

এরপর তিব্বতে রাজাদেশে নাগার্জুনের মাধ্যমিক মতবাদ, দশ শীল ও ছয় পারমিতাচর্চা বিশেষ যত্নের সঙ্গে অনুশীলিত হতে থাকে। কথিত আছে, পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চার চিনা ঘাতক কমলশীলের উদরদেশ নিষ্পেষিত করে হত্যা করে। অদ্যাবধি তাঁর দেহ লাসার কুড়ি মাইল দূরে এক বিহারে সংরি(ত আছে। চার্লস বেল তা দেখে এসেছিলেন। কমলশীলের তিব্বতী শিষ্যের নাম ছিল জেং। আচার্য শান্তরি(ত মারা যান অ(ে( রাঘাতে। কবে, তা জানা যায়নি।

আটষট্টি বৎসর বয়সে রাজা খ্রি-স্রোং-দে-সান মারা গেলেন। কিছুকাল পরে তিব্বতের রাজা হলেন খ্রি-স্রোং-দে-সানের পৌত্র রল-পা-চান (৮১৭-৮৩৬ খৃঃ)। তিব্বতী নাম খ্রি-সুগ-দে-সান। তখন তাঁর মাত্র সতেরো বৎসর বয়স। আসলে জ্যেষ্ঠ পৌত্র গ্লনডার্মা বা লংডার্মা রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পোন ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে সিংহাসনচ্যুত হলেন। রল-পা-চানের আমলে বৌদ্ধ মতবাদ পুনরুজ্জীবিত হয়। ভারতীয় পণ্ডিত জিনমিত্র, সুরেন্দ্রবোধি, শৈলেন্দ্রবোধি ও বোধিমিত্র রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় বহু শাস্ত্র অনুবাদ করেন। তিব্বতী লোসাব জ্ঞানসেন, জয়রি(ত, মঞ্জুশ্রীবর্মন ও রত্নেন্দ্রশীল এবং তিব্বতী পণ্ডিত রত্নপণ্ডিত ও ধর্মরি(ত ঐ অনুবাদ কর্মে যুক্ত( ছিলেন। সে সময়ের আরেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল চিনের রাজা হোয়াংতির সঙ্গে যুদ্ধে তিব্বতের রাজা রল-পা-চানের জয়লাভ। উভয়ের মধ্যে যে সন্ধিচুক্তি( হয় তার স্মারক প্রস্তরস্তম্ভ লাসার মন্দিরের সামনে বিদ্যমান।

দেশে পোন ধর্মের প্রভাব তখনো যথেষ্ট প্রবল। চক্র(ান্ত করে রাজপরিবারে বিপর্যয় ডেকে আনা হল। রল-পা-চানকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা লংডার্মার অনুগত মন্ত্রী, পাস-গিয়াল-তো-রে এবং কো-রে-লেগস-রা, ঘাড় মটকে হত্যা করল। লংডার্মা সিংহাসনে বসলেন। বৌদ্ধমতবাদের উপর শানিত খড়্গ নেমে এলো। সামিয়ে-রামোচে বিহারের দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হল। গ্রন্থাদি গোপনস্থানে লুকিয়ে ফেলা হল। মঠসন্ন্যাসীদের ধর্মত্যাগ করতে নির্দেশ জারী করা হল। অমান্য করলে মৃত্যুর মুখোমুখী হতে হবে। এভাবে বৌদ্ধধর্মের বিনাশ সাধন করে পোন ধর্মের আধিপত্য কায়েম করার বিস্তর চেষ্টা হল।

রাজার প্রবল বিদ্বেষের জন্য তিন বৌদ্ধসন্ন্যাসী পল-চু-বো-রি ধ্যানবিহার থেকে শাস্ত্রাদি নিয়ে পশ্চিম তিব্বতে আত্মগোপন করতে সমর্থ হলেন। তারা নারিস হয়ে ওর



এবং তারপর আমদো চলে যায়। তাঁদের এক শিষ্য দোংপা-রাব-সাল ধর্মপ্রচারকার্যে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন।

লংডার্মা বেশিদিন রাজত্ব করতে পারে নি। তিন বছর পরে (৮৪১ খৃঃ) এক বৌদ্ধ ঘাতক পাল-গাই-দো-জে তিরবিদ্ধ করে হত্যা করে। চার্লস বেল বলেছেন, লংডার্মাকে ৯০০ খৃষ্টাব্দে হত্যা করা হয়েছিল। অলকা চট্টোপাধ্যায় অনেক যুক্তি( সাজিয়ে বলেছেন ৯০১ খৃষ্টাব্দে।

অনন্তর তিব্বতে রাজাসনের একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান হল। নির্বাসিত পুরোহিত-যাজকরা ( মতায় ফিরে এল। রাজ্য লংডার্মার দুই পুত্রের হাতে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত( তিব্বত রাজ্য ন্যস্ত হল। ইয়ুম-তান পূর্ব তিব্বতে এবং ওদ-স্রুংস (৮১৭-৯৮০ খৃঃ) পশ্চিম তিব্বতে রাজত্ব করতে লাগলেন। পরে পশ্চিম তিব্বত বিভক্ত( হয়ে যায় তাং ও নারিস নামের দুটি রাজ্যে। রাজা হন ওদ-স্রুংসের দুই পৌত্র, খ্রি-রা-শিস-সেগস-পা-পল এবং নি-মা-গন। কিছুকাল রাজত্ব করার পরে নি-মা-গনের তিন পুত্রের হাতে নারিস রাজ্য আরো খণ্ডিত হয়। গঠিত হল তিনটি রাজ্য, মন-ইয়ুল (লাদাখ), পুরাং ও গুগে। মন-ইয়ুলে অনেক জলাভূমি-হ্রদ আছে। পুরাং তুষারমৌলি শৃঙ্গমালায় ঘেরা। গুগে উঁচু খাড়া পাহাড়ে ঘেরা পাথুরে স্থান। প্রাচীন নাম শাং-শুং।

পল-গাই-গন মন-ইয়ুল এলাকায়, কা-শিস-গন পুরাং এলাকায় এবং ইদে-সুগ-গন গুগে এলাকায় রাজত্ব করতে থাকেন। ভারতে অবস্থিত লাদাখ রাজ্যের প্রথম রাজা এই পল-গাই-গন। ইদে-সুগ-গনের দুই পুত্র — খোর-দে এবং স্রোং-দে। আমরা রাজা খোর-দের কথা শুরুতেই বলছিলাম।

লংডার্মার প্রবল নির্যাতনের পরে লাচেন গোংপা-রাব-সাল আমদো ও নিম্ন খাম এলাকা থেকে এবং লোচেন রিনচেন সাংপো উপর-নারিসের এলাকা থেকে বৌদ্ধধর্ম পুনরুদ্ধার করে তিব্বতের বুস ও তাং এলাকার সংঘের শক্তি( বাড়াতে থাকেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা দুই শিবিরে বিভক্ত( হয়ে কেউ তন্ত্রবাদী কেউ বিনয়বাদী হয়ে পড়ছিল। প্রকৃত মতবাদ সম্পর্কে ছিল তারা অজ্ঞ। ভারত থেকে লাল আচার্য নামের একজন এবং নীলবসনধারী আরেক সন্ন্যাসী এসে অবস্থা আরো জটিল করে তোলেন। তারা যোগ ও মো(র নামে নারীসঙ্গ (বাইয়োর) এবং জীববলি (গ্রোল) প্রচার করতে থাকে। তন্ত্রের নামে ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করে। এ ব্যাপারে রক্ত(বসনধারী এক ভারতীয় তান্ত্রিকের কথা শোনা যাচ্ছিল খুব। ইনি উড্ডিয়ানের লোক। কা(্মীরের তন্ত্রগুরু রত্নবজ্রের শিষ্য — নাম প্রজ্ঞাগুপ্ত। তিব্বতী নাম শেস-রাব-সাং-পা। তাঁর আঠারোজন তিব্বতী শিষ্য তো পরিচিত হয়ে গেল ডাকাতে-ভি( নামে। নরনারী হরণ করে 'গণচক্র(পূজা'য় নরবলি দিতে লাগল। এমনিতেই তিব্বতে তন্ত্রবাদী বোনপোরা মদ্যপায়ী ও মাংসাশী। নারীসঙ্গ-বিমুখও নয়।